

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার একাদশ গ্রন্থ

অমৃত

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

পৌষ, ১৩২৩

Published by
● GURUDAS CHATTERJEA,
MESSRS GURUDAS CHATTERJEA & SONS
201, Cornwallis street, Calcutta.



Printed by
RADHASYAM DAS
AT THE VICTORIA PRESS.
2, Goabagan Street, Calcutta.]

উপস্থাপনা

উৎসর্গ

বন্ধুবর

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী

করকমলে

এই গ্রন্থ অর্পিত

হইল

ভূমিকা

সপ্তগ্রামে ও চট্টগ্রামে পর্তুগীজ ফিরিঙ্গিগণ যে যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙ্গালায় মোগল শাসনের শৈশবে তাহা রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজকগণের অত্যাচারের কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। পর্তুগীজ জলদস্যুর অত্যাচার ও তদপেক্ষা অধিক পর্তুগীজ পাদ্রীর উৎপীড়নে বাধ্য হইয়া বাদশাহ শাহজহান কাশেম খাঁকে হুগলী আক্রমণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। মহম্মদ আমীন রচিত বাদশাহনামা অথবা তারিখ-ই-শাহজহান নামক গ্রন্থে এই সকল ঘটনার প্রকৃত ইতিহাস প্রদত্ত আছে। পর্তুগীজ পাদ্রী ও জলদস্যুর অত্যাচারই যে বাঙ্গালায় পর্তুগীজ শক্তির অধঃপতনের কারণ, ইংরাজ ঐতিহাসিক কীন (H. G. Keene) ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ স্বর্গীয় ডাক্তার বর্গেস (James Burgess) তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহায্য ব্যতীত শাহজহান পর্তুগীজগণকে পরাজিত করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। ১৬২৯ খৃষ্টাব্দে শাহজহান সুরট বন্দরের ইংরাজ প্রধানকে মোগল সাম্রাজ্য মধ্যে সর্বত্র সকল সময়ে পর্তুগীজ জাহাজ আক্রমণ করিতে ফর্মাণ প্রদান করিয়াছিলেন। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে পর্তুগীজগণ কর্তৃক Inquisition বিচার প্রণালী অবলম্বিত

হইয়াছিল এবং ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে উহা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। কীরে ইতিহাসে ও বাদশাহনামায় বাদশাহের পঠীগীজ পাদীর অত্যাচারের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। অগষ্টিনিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত খৃষ্টান সন্ন্যাসী (Friar) ম্যানরিক্ (Manrique) হুগলী যুদ্ধের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা ইতিহাস নহে, কারণ তাহা একদেশদর্শী। এই যুগের ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে এই আখ্যায়িকা রচিত হইল।

হুগলীর শ্রীমান্ ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষের অনুরোধে মোগল-সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগের ঐতিহাসিক বিবরণ স্বরূপ এই কাহিনী লিপিবদ্ধ হইল। বাদশাহনামা, আমল্-ই-সলিহ, রিয়াজ-উস্-সালাতীন, মাসির-উল্-উমারা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ সমূহ অবলম্বনে এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক অংশ সংকলিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরিদাস নাহা ও শ্রীমান্ ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ইহার পাণ্ডুলিপি লিখিত হইয়াছিল।

কলিকাতা

গ্রন্থকার

৩রা পৌষ, ১৩২৩

মস্মুখ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ললিতা-হরণ

শরৎকাল, মধ্যাহ্ন, ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে সহকার-বৃক্ষের ছায়ায় একখানি ক্ষুদ্র নৌকার উপরে বসিয়া জর্নৈক যুবক অশ্রমনস্ক হইয়া গুণ্ণু করিয়া গান করিতেছিল। তাহার পার্শ্বে তীর ও ধলু এবং দুই তিনটি সন্তোনিহত পক্ষী নৌকার উপরে পড়িয়াছিল। ক্ষুদ্র নৌকার অপর পার্শ্বে জর্নৈক প্রৌঢ় ধীবর লগিতে নোকা বাধিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছিল। একটি বহুপুরাতন ইষ্টকনির্মিত ঘাটের উপরে সহকার বৃক্ষটি শতাব্দিক বর্ষপূর্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, কালক্রমে তাহার আকারবৃদ্ধির অনুপাতে প্রাচীন ঘাটেরও জরাবৃদ্ধি হইয়াছিল। ভাদ্রমাস, ভাগীরথী কূলে-কূলে ভরিয়া উঠিয়াছে, প্রাচীন ঘাটের তিন চারিটি মাত্র সোপান ডুবিতে অবশিষ্ট আছে। ঘাটের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একটি গাভী হরষিত মনে উচ্ছিষ্ট কঁদলী পত্র চর্বণ করিতেছিল। চারিদিক নিস্তব্ধ। সহসা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ঘাটের উপর হইতে বামাকণ্ঠে উচ্চারিত হইল,

“ঘাটে কাহার নৌকা ? নৌকা শীঘ্র সরাইয়া লইয়া যাও ।” শব্দ শুনিয়া ধীবরের নিদ্রা ভঙ্গ হইল, যুবকের গান থামিয়া গেল । ধীবর জিজ্ঞাসা করিল, “কে ?” যে নৌকা সরাইতে বলিয়াছিল, সে পুনরায় বলিল, “তোমরা কেমন লোক গো ? নৌকা সরাইতে বলিতেছি সরাসি না কেন ? মাঠাকুরাণীরা যে ঘাটে যাইতে পারিতেছেন না ?” ধীবর জ্বুদ্ধ হইয়া কহিল, “নৌকা সরিবে না, তোর মাঠাকুরাণীদিগকে অগ্ন ঘাটে যাইতে বল ।”

যুবক মুখ তুলিয়া কহিল, “ভুবন ?” ধীবর নৌকায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “মহারাজ ?” “কি করিতেছ ?” “কেন মহারাজ ?” “ভদ্র মহিলারা গঙ্গাস্নানে আসিয়াছেন, এখানে নৌকা থাকিলে তাঁহারা কেমন করিয়া স্নান করিবেন ?” “ঠাকুরাণীরা যখন এতদূর আসিয়াছেন তখন আর একটু কষ্ট করিয়া অগ্ন ঘাটে গেলেই পারেন । কোথাকার কে স্নান করিতে আসিয়াছে, তাহার জন্ত মহারাজের নৌকা সরাইব ?” “ভুবন, তুমি পাগল হইয়াছ ।” “কেন হুজুর ?” “আমিত পথের ভিখারী, লোকে কেন আমার অন্যায্য আচরণ সহ করিবে ? তুমি নৌকা সরাইয়া লও ।”

ধীবর অগত্যা লগি খুলিয়া লইয়া নৌকা সরাইল এবং দূরে নৌকা বাঁধিল । ঘাট পার হইয়া যাইবার সময় যুবক ডাকিয়া কহিল, “আপনারা ঘাটে আসুন, নৌকা সরাইয়া লইয়াছি ।” ঘাটের অদূরে একটা বৃহৎ বেণুতৃণ, নদী-কুলের তলদেশ ক্ষয়

হওয়ায়, ভাগীরথী-বক্ষে ঢলিয়া পড়িয়াছিল। তাহার নিম্নে বংশ-
 খণ্ডে নৌকা বাঁধিয়া ভুবন পুনরায় শয়নের উদ্যোগ করিতে-
 ছিল; তখন যুবক কহিল, “ভুবন, তুমি আর আমাকে মহারাজ
 বলিয়া ডাকিও না।” ধীরে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,
 “কেন মহারাজ?” “তুমি আমাকে কেন মহারাজ বলিয়া ডাক?”
 “হজুর, আপনার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ সকলেই মহারাজা
 ছিলেন, আপনার বংশের সকলকেই সেই জন্য ‘মহারাজা’
 বলিয়া থাকি।” “কিন্তু আমিও মহারাজা নহি?” “একদিন
 হইবেন,—সকলেই বলে যে ছোট রাজার মৃত্যু হইলে আপনি
 মহারাজা হইবেন।” “ভুল ভুবন, সমস্ত ভুল, বর্তমান মহা-
 রাজার পরে কেশব মহারাজা হইবে, আমি যেমন আছি
 তেমনই থাকিব। তোমরা বর্তমান মহারাজাকে ছোট রাজা
 বলিয়া এবং আমাকে মহারাজা বলিয়া কেবল আমার অনিষ্ট
 কর।” “কেন মহারাজ, আপনার পিতার রাজ্য আপনি কেন
 পাইবেন না?” “খুড়া মহাশয় দিল্লী হইতে ফরমান্ পাইয়াছেন।
 আমি যখন শিশু ছিলাম তখন খাজনা বাকি পড়িয়াছিল
 বলিয়া, স্ববাদের আমার রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছিল, সেই সময়
 ছোট রাজা দিল্লী হইতে ফরমান্ আনাইয়া রাজ্য পাইয়াছেন।”
 “তুই বৎসর খাজানা বাকি পড়িয়াছিল বলিয়া কি আপ-
 নার সাত পুরুষের অধিকার লোপ হইবে?” “বাদশাহের
 হুকুম কে অমান্ত করিবে?” “তাহা হইবে না মহারাজ,
 আপনার পিতার রাজ্য আপনিই ফিরিয়া পাইবেন—” মহা

তীর হইতে কে বলিয়া উঠিল, “ময়ূখ, তাহাই সত্য, সত্য, তোমার পিত্রাজ্য তুমি ফিরিয়া পাইবে।”

যুবক ও ধীবর চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, তীরে বেণু-কুঞ্জের মূলে এক দীর্ঘকায় গৈরিকধারী সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়া যুবকের দেহ রোমাঞ্চিত হইল, তিনি ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রভু, আপনি কি বলিতেছেন?”

“সত্য বলিতেছি, ময়ূখ, কিছুদিন পরে তুমি তোমার পিত্রাজ্যের অধীশ্বর হইবে।” যুবক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, “প্রভু, তাহা অসম্ভব।”

“জগতে কিছুই অসম্ভব নহে, ময়ূখ। ধর্মপথে থাকিও, সত্য হইলে বিচলিত হইও না, দেবতা, ব্রাহ্মণ, রমণী ও শিশুকে রক্ষা করিও, অসহায় ও অনাথের সহায় হইও; তাহা হইলে ভগবান্ একদিন মুখ তুলিয়া চাহিবেন। সম্মুখে পরীক্ষা উপস্থিত।” যুবক ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল সন্ন্যাসী অন্তর্হিত হইয়াছেন। যুবক বিস্মিত হইয়া ধীবরের মুখের দিকে চাহিলেন, ধীবরও তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। যুবক জিজ্ঞাসা করিল, “ভূবন, সন্ন্যাসী ঠাকুর কোন্ দিকে গেলেন?” ভূবন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিল, “তাই ত! ঠাকুর কোন্ দিকে গেলেন?” “তুমি দেখ নাই?” “না— মহারাজ, আমি চক্ষু মুদিয়া ছিলাম।” “কেন?” “মহারাজ,—” “ভূবন, আবার মহারাজ?” “হজুর, আমার সাতপুরুষ যে কথা

বলিয়া আসিয়াছে আমি একদিনে সে অভ্যাস কেমন করিয়া ছাড়িব ?” “ভাল। চক্ষু মুদিয়াছিলে কেন ?” “ভয়ে।” “সে কি ভুবন, তোমার ভয় ?” “মহারাজ, মানুষকে অথবা জানোয়ারকে ডরাই না। কিন্তু ঐ গেকুয়াপরা ঠাকুরদের দেখিলে আমার বুক কাঁপিয়া উঠে।” “সত্য বলিয়াছ, সন্ন্যাসীরা বড়ই ক্রোধনস্বভাব।”

ভুবন কথা কহিল না দেখিয়া যুবক তাহার দিকে চাহিলেন, দেখিলেন সে দূরে নদীবক্ষে একখানি নৌকার দিকে চাহিয়া আছে। যুবক তখন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভুবন, কি দেখিতেছ ?” ভুবন মুখ না ফিরাইয়াই কহিল, “মহারাজ, নৌকা থানা বড় জোরে চলিতেছে।” “বোধ হয়, ফৌজদারের ছিপ্।” “না, ছিপ্ নয়, হুজুর, একখানা কোশা।” “কোশা কি কখনও জোরে চলিতে পারে ?” “ফিরিজীর কোশা চলে।” “এখানে ফিরিজীর কোশা কোথা হইতে আসিবে ? সপ্তগ্রাম বহুদূর।” “আমিও তাহাই ভাবিতেছি।” “আমাদের মক্শুসাবাদে বাদশাহী নাওয়ারার কোশাত নাই। হয়ত ঢাকা হইতে আসিয়াছে।” “হুজুর, প্রকাণ্ড কোশা, একদিকে পঞ্চাশখানা বৈঠা পড়িতেছে—”

সহসা ভুবন কাঁপিয়া উঠিল, যুবক ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি ?” ভুবন উত্তর না দিয়া নৌকা হইতে তাহার ধনু উঠাইয়া লইল, তাহা দেখিয়া যুবকও ধনু উঠাইলেন। দেখিতে দেখিতে একখানা দীর্ঘ নৌকা তীরবেগে গঙ্গার মধ্যস্থলে আসিয়া

পৌছিল। দুই তিন খানা বৃহৎ মহাজ্ঞানী নৌকা পালভরে ধীরে ধীরে উজ্জান চলিতেছিল, কোশাখানি তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দুইতিন বার বন্দুকের শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে এক-খানি নৌকা ডুবিয়া গেল। সেই সময়ে ভুবন বলিয়া উঠিল, “মহারাজ, ঠিক বলিয়াছিলাম, ফিরিজি হার্মাদের কোশা, তিন খানা নৌকাই মরিবে।”

ক্রমাগত বন্দুকের শব্দ হইতে লাগিল; দেখিতে দেখিতে তিনখানি নৌকাই ডুবিয়া গেল। সহসা নক্ষত্রবেগে কোশা তীরের দিকে ছুটিয়া আসিল, এবং দেখিতে দেখিতে পূর্ববর্ণিত জীর্ণ ঘাটে লাগিল। ঘাট হইতে বামা-কণ্ঠ-নিঃসৃত আৰ্ত্তনাদ শ্রুত হইল; তাহা শুনিয়া যুবক কহিলেন, “ভুবন, নৌকা ছাড়িয়া দাও।”

“হজুর, বলেন কি? আমরা এই দুইজন লোক, হার্মাদের নৌকায় পঞ্চাশ জন বন্দুকধারী আছে, জানিয়া শুনিয়া মরিতে যাইব?” “নৌকা খুলিয়া দাও, না দিলে আমি তীরে নামিয়া যাইব।” “একই কথা, তবে একটা কথা রাখুন, নৌকা এই বাঁশঝাড়ের মধ্যে ঢুকাইয়া দিই, তাহা হইলে সহজে দেখিতে পাইবে না। আহুন, দুইজনে তীর ছাড়িতে আরম্ভ করি।”

ক্ষুদ্র নৌকা অনায়াসে বেণুকুঞ্জে প্রবেশ করিল; যুবক দেখিলেন, ঘাটের উপরে একজন ফিরিজি একটি রমণীকে নৌকায় উঠাইবার চেষ্টা করিতেছে, রমণী ঘাটের সোপানগুলি

আকর্ষণ করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছে, আর বলিতেছে, “হরি, নধুসূদন, রক্ষা কর।” সহসা দুইটা তীক্ষ্ণ শর আসিয়া দস্যুর চক্ষু ও বাম ঋক্ষ বিদ্ধ করিল, সে ঘাটের উপর হইতে জলে পড়িয়া গেল। নাবিকগণ ও দুই তিনজন ফিরিঙ্গী নৌকার ছিদ্ৰ মেরামত করিতেছিল, তাহারা আহত ব্যক্তিকে জল হইতে তীরে উঠাইল। বেণুকুঞ্জ হইতে শ্রাবণের বারিধারার ত্রায় শরবর্ষণ হইতে লাগিল, দশ পনের জন আহত হইল। তাহা দেখিয়া নাবিক ও ফিরিঙ্গিগণ ঘাটের পার্শ্বে আশ্রয় লইয়া বন্দুক ধরিল। দস্যুপরিত্যক্তা রমণী চেতনা হারাইয়া ঘাটের উপরে পড়িয়া রহিল।

বন্দকের সহিত ধমু লইয়া কতক্ষণ যুদ্ধ চলিতে পারে? ভুবন দুই তিন স্থানে আহত হইয়াছিল, ক্রমে ভূণের শর ফুরাইয়া আসিল, তখনও অবিরাম গুলি বর্ষণ হইতেছিল। একটি গুলি আসিয়া যুবকের কর্ণমূলে লাগিল, যুবক মূর্ছিত হইয়া নৌকার উপরে পতিত হইলেন। তাহা দেখিয়া ভুবন নৌকা টানিয়া বাহির করিল এবং বন্ধনরজ্জু দস্তে ধারণ করিয়া জলে লাফাইয়া পড়িল; স্রোতের মুখে ক্ষুদ্র নৌকা দ্রুতবেগে ভাসিয়া গেল। তখন ফিরিঙ্গিগণ নৌকা মেরামত করিয়া মূর্ছিতা রমণীকে তাহাতে উঠাইয়া লইল এবং নৌকা ভাসাইয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া গেল।

ফিরিঙ্গিগণের নৌকা দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে, সেই সম্ম্যাসী ঘাটের উপরে আসিয়া দাঁড়াইল এবং কহিল, “অন্ত

এই প্রথম, গঞ্জালিস্ আজি হইতে আমার প্রতিশোধ আরম্ভ ।
বান্ধালাদেশ ফিরিঙ্গী দস্যুর অত্যাচার হইতে মুক্ত করিব।”
সন্ন্যাসী জলে নামিল এবং স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া দক্ষিণাভি-
মুখে চলিল ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সমাজ-শাসন

“এইবার গৌসাইজীকে দেখিয়া লইব । ধর্ম্ম আছেন,
ব্রাহ্মণের উপরে অত্যাচার কখন সহ হয় ? দর্পহারী মধুসূদন,
তুমি সত্য । আমি ফুলের মুখটী, বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান,
আমার উপর অত্যাচার ?”

ভাগীরথীর পশ্চিম পারে একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে একটি
প্রাচীন অশ্বখ বৃক্ষের নিম্নে ইষ্টকনির্ম্মিত বেদীর উপরে
বসিয়া কতিপয় বৃদ্ধ ও প্রৌঢ় সমাজসংস্কারে ব্যাপৃত ছিলেন ।
তাহাদিগের মধ্যে একজন বক্তাকে কহিলেন, “ওহে হরিনাথ,
এখন কি করা যায় বল দেখি ?”

“আবার কি? গৌসাই আমার যে ব্যবস্থা করিয়াছিল
তাহারও সেই ব্যবস্থা ; আজি হইতে রাধামোহন গোস্বামীর

ছকা বন্ধ, নাপিত বন্ধ, রজক বন্ধ। গৌসাই সপরিবারে বৈরাগী হউক না হয় বৃন্দাবনে যাউক। কি বল মাধব খুড়া?”

তৃতীয় বৃদ্ধ ধীরে ধীরে কহিল, “তাহাই ত ব্যবস্থা। রাধামোহন গোস্বামীর অবিবাহিতা যুবতী কণ্ঠাকে যখন ফিরিজিতে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, তখন দোষ পিতৃকুলকেই স্পর্শ করিয়াছে।”

দ্বিতীয় বক্তা মাধব খুড়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “খুড়া, ইহাই কি শেষ সিদ্ধান্ত? ব্রাহ্মণের শাস্তি বড় কঠোর হইল না?”

“কঠোর কিসে? এই সকল বিষয়ে গুরুতর দণ্ড বিধান না করিলে কিছু দিন পরে রাধামোহন গোস্বামী সমাজের বক্ষে পদাঘাত করিয়া ফিরিজী জামাতা ঘরে লইয়া আসিবে।” “কিহে, কালিদাস, কি বল?” “তাই ত, কি করা যায়?”

হরি। দেখ কালিদাস, তোমরা যদি রাধামোহন গোস্বামীকে সমাজচ্যুত না কর, তাহা হইলে আমি আত্মহত্যা করিব, আর তোমাদের ব্রহ্মহত্যার পাপ হইবে।

মাধব। সে কি কথা হরি, তুমি আমার দশ রাজের জ্ঞাতি, তোমাকে ছাড়িয়া আমি কি স্তবর্ণ বণিকের ব্রাহ্মণ রাধামোহন গোস্বামীর পক্ষ অবলম্বন করিতে যাইব?

হরি। তবে গোস্বামী সমাজচ্যুত হইল ?

মাধব। হইল বৈ কি।

এই সময়ে জর্নৈক দীর্ঘাকার শ্রামবর্ণ ব্রাহ্মণ অস্থত-
তলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সমবেত
ব্রাহ্মণগণ সকলেই অভিবাদন করিলেন। আগন্তুক জিজ্ঞাসা
করিলেন—“কিহে মাধব, ব্যাপার কি ?”

“তর্করত্ন মহাশয়, শুনিতে পাওয়া গেল রাধামোহন গোস্বা-
মীর কণ্ঠ্যকে ফিরিঙ্গীতে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে”—“বল কি ?
কখন লইয়া গেল ?” “এই দণ্ড দুই পূর্বে।” “রাধামোহন
শুনিয়াছে ?” “খুব শুনিয়াছে, আমি নিজে গিয়া শুনাইয়া
আসিয়াছি।” “তোমরা বৃদ্ধের দল এখানে বসিয়া কি করি-
তেছ ?” “কি আর করিব ? সমাজরক্ষার ব্যবস্থা করিতেছি।”
“তোমরা কি পুরুষ না রমণী, দস্যুতে ব্রাহ্মণকণ্ঠ্যকে অপহরণ
করিয়া লইয়া গিয়াছে, তোমরা তাহার উদ্ধারের চেষ্টা না
করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আছ ? তোমরা না কুলীন
সমাজের অগ্রণী, রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ সমাজের মুকুটমণি ? মাধব,
সমাজরক্ষার কি ব্যবস্থা করিতেছ ?” “গোস্বামীর ধোপা
নাপিত বন্ধ করিয়াছি।” “গোস্বামীর অপরাধ ?” “বলেন
কি তর্করত্ন মহাশয়, গোস্বামীর অবিবাহিতা যুবতী কণ্ঠ্যাটাকে
ফিরিঙ্গীতে ধরিয়া লইয়া গেল, সমাজ ইহার কোন প্রতিবিধান
করিবে না ? কঠোর শাস্তি বিধান না করিলে সমাজ অধঃ-
পাতে যাইবে। দুইদিন পরে রাধামোহন গোস্বামী ফিরিঙ্গী

জামাতাকে ঘরে আনিয়া সমাজ নিমজ্ঞণ করিবে।” “হরি, রাধামোহন কি ফিরিঙ্গীকে নিমজ্ঞণ করিয়া আনিয়া কণ্ঠা সম্প্রদান করিয়াছে?” “না।” “তবে কি হইয়াছে?” “গোস্বামীর কণ্ঠা গঙ্গান্নানে গিয়াছিল, ফিরিঙ্গীরা তাহাকে ঘাট হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।” “তাহাতে রাধামোহনের অপরাধ কি?” “অবিবাহিতা কণ্ঠাকে শ্লেচ্ছ ফিরিঙ্গী ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাতে পিতৃকুলের দোষ হইবে না?” “পিতৃকুলের অপরাধ? এই মাত্র বলিতে পার যে কণ্ঠা গঙ্গান্নানে যায় কেন? এই সমাজে কাহার মাতা, কাহার বনিতা, কাহার ভগিনী গঙ্গান্নানে না গিয়া থাকে?” রাঢ়ীয় কুলীন সমাজ নিরুত্তর। কিয়ৎক্ষণ পরে হরিনাথ সাহসে ভর করিয়া কহিল, “কিন্তু সমাজ রক্ষার উপায় কি হইবে?”

“সমাজের ত কোন হানি হয় নাই। তোমার ভগিনী যখন মুসলমানের সহিত কুলত্যাগ করিয়াছিল, তখন তুমি তাহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলে, সেইজন্য তোমার প্রতি দণ্ডবিধান করিয়া সমাজ রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। রাধামোহনের কণ্ঠা কি ফিরিঙ্গীর ঔরসজাত পুত্র প্রসব করিয়াছে?”

হরিনাথ অগত্যা নীরব হইল। তর্করত্ন প্রুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “সমাজের কোন হানি হয় নাই, তথাপি সমাজ রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছ; কিন্তু বৃদ্ধ অপুত্রক রাধামোহনের

একমাত্র কন্যা দস্যকর্ভুক অপহৃত হইয়াছে, তাহার উদ্ধারের কি ব্যবস্থা করিয়াছ ?”

“কি করিব ? ফিরিঙ্গী হান্সাদ গোলা গুলি লইয়া লড়াই করে, একি যে সে দস্য যে লাঠিয়াল পাঠাইয়া লড়াই করিব ? ফৌজদার স্ববাদার অবধি ফিরিঙ্গীর ভয়ে শঙ্কিত ; সেখানে আমরা কি করিব ?”

হরি । কিন্তু গোস্বামীকে জ্ঞাতীচ্যুত করা উচিত ।

তর্করত্ন । তোমরা ঝালু না পাষণ ? উপকার করিতে পার না, কিন্তু অপকার করিতে জান । অভাগিনীকে উদ্ধার না করিয়া তাহার পিতাকে জ্ঞাতীচ্যুত করিতে বসিয়াছ ? নারায়ণ ! এই ব্রাহ্মণসমাজ রসাতলে যায়না কেন ?

পশ্চাৎ হইতে গম্ভীরস্বরে উচ্চারিত হইল, “অনেক দিন গিয়াছে । তর্করত্ন, ইহা সমাজের কবন্ধ ।” সকলে বিস্মিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন, বৃদ্ধ রাধামোহন গোস্বামী অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছেন । মুহূর্ত্তমধ্যে তর্করত্ন তাঁহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিলেন, সহানুভূতি পাইয়া বৃদ্ধ ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল । সেই অবসরে কুলীনকুলচূড়ামণি হরিনাথ মুখোপাধ্যায় পলায়ন করিল ।

তর্করত্নের স্বন্ধে মস্তক রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে বৃদ্ধ গোস্বামী কহিলেন, “ভাই, ললিতা আমার দুইদিন উপবাসী ছিল, ব্রত সাঙ্গ করিয়া গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিল, সেই অবস্থায় দুর্ভিক্ষ ফিরিঙ্গী তাহাকে

ধন্বিয়া লইয়া গিয়াছে। আহা! মা আমার আর নাই! জগতে এমন কে আছে যে পরাক্রান্ত দস্যুর হস্ত হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিবে?”

পশ্চাৎ হইতে ধ্বনিত হইল, “আছে, যে প্রকৃত রাজা সে তোমার কণ্ঠা উদ্ধার করিতে গিয়াছে।” সকলে ফিরিয়া দেখিলেন যে, দূরে পনস তরুতলে একজন দীর্ঘাকার গৈরিক-বসন-পরিহিত সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া আছেন। সন্ন্যাসী পুনর্বার কহিলেন, “গোস্বামী, গৃহে ফিরিয়া যাও, তোমার কণ্ঠা ফিরিয়া আসিবে। আজ দেবেন্দ্রনারায়ণ নাই, কিন্তু তাহার পুত্র আছে; যে উত্তর রাঢ়ের প্রকৃত অধীশ্বর সে দস্যুর দণ্ডবিধান করিতে গিয়াছে। ফিরিয়া যাও, গৃহ-দেবতার নিকটে তাহার মঙ্গল কামনা কর।”

সন্ন্যাসী উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া প্রস্থান করিলেন, গ্রামবাসিগণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে রুধিরাপ্লুত-দেহ বৃদ্ধ ভুবন ধীরে ধীরে আসিয়া তর্করত্নকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “ঠাকুর, আমাদের মহারাজকে দেখিয়াছেন?” তর্করত্ন বিস্মিত হইয়া কহিলেন, “না। ভুবন, তুমি আঘাত পাইলে কোথায়?” “ফিরিঙ্গীর সহিত যুদ্ধে।” “কখন?” “দুই দণ্ড পূর্বে, ঠাকুরের কণ্ঠাকে উদ্ধার করিতে গিয়া।” “মহারাজ কোথায়?” “তিনিও আহত হইয়াছেন। ধনু ও তীর লইয়া যতক্ষণ বন্দুকের সহিত যুদ্ধ সম্ভব ততক্ষণ দুই জনে যুঝিয়া ছিলাম। তিনি অজ্ঞান হইয়া নৌকায় পড়িয়া গেলে, আমি নৌকা

ভাসাইয়া দিয়া জলে পড়িয়াছিলাম আর নৌকার কাছি ধরিয়া সাঁতার দিয়া পলাইলাম। রাজ্যমাটির নিকট নৌকা তীরে লাগাইলাম। মহারাজের জ্ঞান হইলে তাঁহাকে গঙ্গাতীরে বসাইয়া রাখিয়া গ্রামে লোক ডাকিতে গিয়াছিলাম, ফিরিয়া আসিয়া দেখি নৌকাও নাই মানুষও নাই। নদীর তীরে তীরে তাঁহার সন্ধান করিতে করিতে আসিয়াছি; কিন্তু কোথাও তাঁহার চিহ্ন পাই নাই।”

কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া তর্করত্ন কহিলেন—“ভূবন, মহারাজকে আমরা দেখি নাই। তিনি বোধ হয় তোমার নৌকা লইয়া হান্সাদের নৌকার অনুসরণ করিয়াছেন। তুমি তোমার বড় নৌকা প্রস্তুত কর; দেবেন্দ্রনারায়ণের অন্নের ঋণ যে যে এখনও স্বীকার করে তাহাদিগকে প্রস্তুত হইতে বল। মহারাজ একাকী গিয়াছেন, কি হইবে বলিতে পারা যায় না। হয় ত আজি দেবেন্দ্রনারায়ণের বংশ লোপ হইবে। তুমি বিলম্ব করিও না। দুই দণ্ডের মধ্যে তোমার নৌকায় আমি সপ্তগ্রাম যাত্রা করিব। আমি রাজবাটিতে চলিলাম।”

তর্করত্ন দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন, ভূবনও অল্প দিকে চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ মজুমুন্দের ভ্রায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া গোস্বামীও গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তখন মাধব খুড়া কহিলেন—“কি হে কালিদাস, কি রকম বুঝিতেছ?” “গোস্বামীকে সমাজচ্যুত করা অসম্ভব।” “তর্করত্ন যখন বিরূপ

তখন আর উপায় কি ?” “তর্করত্নটী যেন ফৌজদারের সিপাহী
—হরিনাথ কোথায় ?” “গোস্বামীকে দেখিয়াই পলায়ন
করিয়াছে ।” “সন্ধ্যা হইল, চল ঘরে যাই ।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আশ্রয় লাভ

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদের শেষ বৎসরে, ভাদ্র
মাসে, প্রশস্ত গঙ্গাবক্ষে একখানি দীর্ঘাকার নাতিপ্রশস্ত নৌকা
দ্রুতবেগে দক্ষিণাভিমুখে যাইতেছিল । সন্ধ্যা আগতপ্রায় ;
ভাগীরথীর উভয় কূল ধূসরবর্ণ ছায়ায় আবৃত হইয়া আসিতেছে ;
প্রথম সন্ধ্যায় আলো অঁধারে নৌকার নাবিকগণ সম্মুখে এক-
খানি ক্ষুদ্র নৌকা দেখিতে পাইয়া তাহা দূরে লইয়া যাইতে
কহিল ; কিন্তু ক্ষুদ্র নৌকার আরোহী বা নাবিক শুনিতে পাইল
না, অথবা * গ্রাহ্য করিল না । দেখিতে দেখিতে দ্রুতগামী
নৌকাখানি ক্ষুদ্র নৌকার পার্শ্বে আসিয়া পড়িল । নাবিকগণ
দেখিতে পাইল যে, ক্ষুদ্র নৌকা কর্ণধারবিহীন, শ্রোতের মুখে
ভাসিয়া যাইতেছে, নৌকার গর্ভে একটি মনুষ্য দেহ পড়িয়া
রহিয়াছে । সহসা বৃহদাকার নৌকার গতি পরিবর্তিত হইল,
তাহা ফিরিয়া আসিয়া ক্ষুদ্র নৌকার পার্শ্বে আসিয়া লাগিল,

দুই তিন জন নাবিক ক্ষুদ্র নৌকায় উঠিয়া আরোহীর দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিল যে, সে তখনও জীবিত আছে, কিন্তু রক্তশ্রাবে অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। নাবিকগণ তাহাকে নিজ নৌকায় উঠাইয়া ক্ষুদ্র নৌকা ভাসাইয়া দিল। বৃহৎ নৌকা পুনরায় দক্ষিণাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিল। নৌকারোহিগণের শুশ্রুষায় আহত ব্যক্তির চেতনা ফিরিলে, নাবিকগণ তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু সে পরিচয় না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তোমরা কোথায় বাইবে?” নাবিকগণ কহিল,—“আমরা সপ্তগ্রামে বাইব।” “পথে আর কোন নৌকা দেখিয়াছ?” “না।” “তুমি আহত হইলে কিরূপে?” “ফিরিঙ্গীর সহিত যুদ্ধে।” “ফিরিঙ্গীর সহিত যুদ্ধে? কেমন করিয়া বিবাদ বাধিল? কোথায় যুদ্ধ হইল?” “মকস্‌সাবাদের নিকটে গোঁরীপুরে।” “ফিরিঙ্গী কি তোমার নৌকা মারিয়াছিল?” “না, আমার এক আত্মীয়াকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।”

এই কথা শুনিয়া একজন নাবিক নৌকার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল এবং ক্ষণকাল পরে জনৈক প্রৌঢ় ব্যক্তির সহিত ফিরিয়া আসিল। প্রৌঢ় যুবকের কাহিনী শুনিয়া তাহাকে পরিচয় দিতে অনুরোধ করিল, কিন্তু যুবক কিছুতেই পরিচয় দিল না। তখন প্রৌঢ় কহিল, “যুবক, তুমি বীর, অস্ত্র ধরিতে জান, বন্দুক ধরিতে শিখিয়াছ কি?” “এমন কোন অস্ত্র নাই যাহা ধরিতে শিখি নাই।” “তুমি কি জাতি?” “আমি

ব্রাহ্মণ। অন্য কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না; আপনি জীবনদাতা, আপনার আদেশ অমান্য করিতে হইলে সংকোচ বোধ হয়।”

যুবক ব্রাহ্মণবংশজাত শুনিয়া প্রৌঢ় তাহাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন এবং কহিলেন, “ঠাকুর, আপনি ভিতরে আসুন।” নৌকায় একটি মাত্র কক্ষ ছিল, তাহার মধ্যে বহুমূল্য শয্যায় অনিন্দ্যাস্থন্দরকাস্তি এক যুবক বসিয়া ছিল। প্রৌঢ় কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহাকে কহিলেন—“গোষ্ঠ, আমাদের অতিথি ব্রাহ্মণ, প্রণাম কর।” যুবা উঠিয়া অতিথিকে প্রণাম করিল। তখন প্রৌঢ় পুনরায় কহিলেন, “গোষ্ঠ, আমাদের খাস বন্দুকগুলি বাহির করিয়া আন।” যুবক কক্ষের নিম্নে নৌকাগর্ভ হইতে সাত আটটি বহুমূল্য বন্দুক বাহির করিল। প্রৌঢ় ময়ূথকে কহিলেন, “ঠাকুর, ভাল দেখিয়া একটি বন্দুক বাছিয়া লউন।” ময়ূথ একটি ক্ষুদ্র বন্দুক বাছিয়া লইলেন। গোষ্ঠ নৌকার ছাদ হইতে থলিয়া ভরা বাক্স ও গুলি বাহির করিল এবং তাহা ময়ূথের হস্তে প্রদান করিল। তখন প্রৌঢ় জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঠাকুর, আপনি কি ক্লাস্ত হইয়াছেন?” ময়ূথ কহিল “না।” “তবে বাহিরে আসুন, নিশাযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকি।” “মাঝি মাঝারা কি বন্দুক ধরিতে জানে?” “ঠাকুর, মাঝারা কেহই ধীবর নহে, তাহারা শিক্ষিত সেনা, আবশ্যক মত নাবিকের কার্য্য করিয়া থাকে।” “কতজন মাঝা আছে?” “দেড় শত, সকলের

নিকটেই বন্দুক আছে।” “সেগুলি ভরিয়া রাখিলে হয় না?”
“চলুন, বাহিরে যাই।”

তিন জনে কক্ষের বাহিরে আসিলেন। তখন শুক্লা নবমীর জ্যোৎস্না চারিদিকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, অন্ধকার কূলে কূলে বিটপিরাজির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। প্রৌঢ় কর্ণধারকে ডাকিলেন, সে একজন নাবিকের হস্তে হাল দিয়া তাঁহার নিকটে আসিল। প্রৌঢ় কহিলেন, “কেনারাম, প্রস্তুত হও, বোধ হইতেছে রাত্রিতে লড়াই করিতে হইবে।”

কেনারাম কিছুমাত্র বিস্মিত না হইয়া কহিল, “কাহার সহিত হুজুর?” “ফিরিজি হারমাদের সহিত।” “এখানেও ফিরিজি? আমরা ভাবিয়াছিলাম যে, সারা বাঙ্গলা মুলুকে একমাত্র সাতগাঁই জলিয়া থাক হইয়া গেল। তবে তোপ দুইটা বাহির করি?” “কর। বারুদের অভাব হইবে না ত?” “হুজুর, ষাথেষ্ট বারুদ আছে। অভাব হইবে লোকের, এত বড় ছিপ লইয়া লড়াই করিতে হইলে তিন শত লোকের প্রয়োজন, দুই শত নৌকা বাহিবে, আর এক শত লড়াই করিবে।” “তোমাদের বন্দুকগুলি ভরিয়া রাখিতে বল।” “সমস্ত বন্দুক প্রস্তুত আছে, কেবল তোপ দুইটা ভরিয়া রাখিতে হইবে।” “শীঘ্র ভরিয়া লও।”

কর্ণধারের আদেশে দশ পনের জন মাল্লা নৌকাগর্ভ হইতে দুইটা তোপ তুলিয়া তাহা নৌকার উপরে সাজাইল এবং কর্ণধারের নির্দেশ অনুসারে তাহা নৌকার উপরে বসাইয়া

বারুদ ও গোলা ভরিয়া রাখিল। তখন সকলে মিলিয়া নৌকা বাহিতে আরম্ভ করিল, নৌকা নক্ষত্র বেগে ছুটিল।

রজনীর দ্বিতীয় যাম অতিবাহিত হইলে, ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে তীব্র আলোক দৃষ্ট হইল। তাহা দেখিয়া প্রৌঢ় কর্ণধারকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কিছু, কিসের আলো?” “কোনও গ্রামে আগুন লাগিয়াছে বোধ হয়।” “আলো বড়ই জোর, দুই এক খানি ঘরে আগুন লাগিলে এত আলো হইত না।” দেখিতে দেখিতে নৌকা আলোকের নিকটবর্তী হইল, সকলে দেখিতে পাইলেন যে, একখানি বৃহৎ গ্রাম অগ্নিতে জলিয়া উঠিয়াছে; তখন প্রৌঢ় কহিলেন, “এত বড় গ্রাম এক সঙ্গে জলিয়া উঠিল কি করিয়া?” কেনারাম কহিল, “হজুর, বোধ হয়, কেহ ইচ্ছা করিয়া আগুন লাগাইয়া দিয়াছে।” “ফিরিজি নহে ত?” “ভগবান্ জানেন, হজুর, অনুমতি হইলে ছিপ কিনারায় লাগাই। ছায়ায় ছায়ায় চলিলে বিপদের সম্ভাবনা অল্প।” “তবে তাহাই কর।” ছিপ ফিরিল এবং ভাগীরথীর পশ্চিম কূলের নিম্নে চলিতে আরম্ভ করিল। সহসা কর্ণধার দীর্ঘাকার কেশা দেখিতে পাইয়া একটি ক্ষুদ্র খালের মধ্যে ছিপ চালাইয়া দিল। বৃক্ষতলের অন্ধকারে ছিপ বাঁধিয়া সকলে তীরে নামিল, কেবল পঁচিশ জন নাবিক পাহারায় রহিল। তীরে নামিয়া প্রৌঢ় জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঠাকুর, এ গ্রাম কি আপনার পরিচিত?” ময়ূখ কহিলেন, “না, গ্রামের ভিতরে প্রবেশ না করিয়া গঙ্গাতীরের পথে চলুন, তাহা হইলে নৌকা

ও দস্যাদলের মধ্যে গিয়া পড়িব।” প্রৌঢ় কহিলেন, “উত্তম কথা; ঠাকুর, তুমি যুদ্ধ ব্যবসায় পারদর্শী দেখিতেছি। সকলে নদীকূলের উচ্চ ভূমির আশ্রয়ে ধীরে ধীরে চল।”

প্রৌঢ়, গোষ্ঠ, ময়ূখ, নাবিকগণের অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিলেন। কিয়দূর অগ্রসর হইয়া, ময়ূখ কহিলেন, “দেখুন, নাবিকগণকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া লই, একদল নাবিক গ্রামবাসিগণের রক্ষায় যাউক, দ্বিতীয়দল তাহাদের প্রত্যাবর্তনের পথরোধ করুক।” “উত্তম কথা, কে কোন্ পথে যাইবে?” “আমি গ্রাম রক্ষায় যাইতেছি, আপনারা পিতাপুত্রে অগ্রসর হউন।”

সপ্ততি জন নাবিক ময়ূখের সহিত গ্রামের দিকে যাত্রা করিল; অবশিষ্ট নাবিকগণকে লইয়া প্রৌঢ় ও গোষ্ঠ নৌকার দিকে অগ্রসর হইলেন। ক্ষণকাল পরে গ্রামমধ্যে ক্রমাগত বন্দুকের শব্দ হইতে লাগিল; এবং মুহূর্ত্তপরে একজন নাবিক ফিরিয়া আসিয়া প্রৌঢ়কে কহিল, “আমাদের দেখিয়া দস্যুরা পলাইতেছে, তাহাদিগের নৌকা কোথায়?” প্রৌঢ় কহিলেন,— “নৌকা ত খুঁজিয়া পাই নাই, দস্যুরা কি ফিরিঙ্গি?” “হয় মগ্ না হয় ফিরিঙ্গি।”

এই সময়ে ফিরিঙ্গিদিগের কোশার মত একখানি বড় নৌকা আর একটি খালের ভিতর হইতে বাহির হইয়া গঙ্গায় পড়িল, তাহা দেখিয়া প্রৌঢ় নাবিককে কহিলেন, “বোধ হয়, ঐ দস্যুদিগের নৌকা, তুমি ঠাকুরকে গিয়া বল যে আর গ্রামে

বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই, দস্যুরা নৌকায় উঠিয়া পলাইয়াছে। যত শীঘ্র সম্ভব নৌকায় ফিরিয়া আসিও।”

নাবিক চলিয়া গেল, প্রৌঢ় নৌকায় ফিরিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ময়ূখ ও অন্যান্য নাবিকগণ নৌকায় ফিরিয়া আসিলেন। নৌকা তৎক্ষণাৎ দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিল। কক্ষে বসিয়া প্রৌঢ় ময়ূখকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঠাকুর, আর দুই দিনে সপ্তগ্রাম পৌঁছিব। আপনি সপ্তগ্রামে কোথায় বাইবেন?” “ফৌজদার কলিমুল্লা খাঁর নিকটে।”

“একদিনেই কি ফৌজদারের সাক্ষাৎ পাইবেন? সপ্তগ্রামে কি আপনার কোন পরিচিত লোক আছে?” “কেহ না, তবে আমার পিতার দুই একজন বন্ধু আছেন।” “তাহারা কি আপনাকে জানেন?”

“আমার নাম শুনিয়াছেন, কিন্তু কখনও আমাকে চক্ষে দেখেন নাই।” “তবে আশ্রয় লইবেন কোথায়?” “যদি কেহ চিনিতেই না পারেন, তাহা হইলে অতিথিশালায় আশ্রয় লইব।” “যদি অল্পগ্রহ করিয়া সপ্তগ্রামে আমার কুটীরে বাস করেন, তাহা হইলে চরিতার্থ হইব।”

“আপনি জীবনদাতা, যখন যাহা আদেশ করিবেন আমি সানন্দে তাহাই সম্পাদন করিব। আমি সপ্তগ্রামে অপরিচিত, কপর্দকশূন্য ভিখারী; আপনি দয়া করিয়া দ্বিতীয়বার আমাকে আশ্রয় দিতে চাহিয়াছেন, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য—”

সহসা গুড়ুম করিয়া তোপের আওয়াজ হইল, সঙ্গে সঙ্গে

ছিপ কাঁপিয়া উঠিল, প্রৌঢ় কক্ষের দীপ নিবাইয়া ত্রস্ত পদে বাহিরে আসিলেন এবং দেখিলেন যে, দূরে কোশার ঝায় এক খানি বৃহৎ নৌকা অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহাকে বাহির হইতে দেখিয়া কেনারাম তাঁহার নিকটে আসিল এবং কহিল, “হুজুর, ফিরিঙ্গি হারুমাদ বোধ হয় পিছু লইয়াছে, গোলা লাগিয়া একজন মাল্লা মরিয়াছে।”

প্রৌঢ় কহিলেন,—“আমাদের তোপ প্রস্তুত আছে ত?”

“আছে, কিন্তু তাহার গোলা অতদূর পৌঁছবে না।”
 “তবে শীঘ্র নৌকা ফিরাও।” মুহূর্ত্ত মধ্যে ছিপ ফিরিল এবং উত্তরাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিল। তখন প্রৌঢ় ময়ূখকে কহিলেন, “ঠাকুর, এ অত্যাচার আর সহ হয় না,—এইবার আমি স্বয়ং অস্ত্র ধরিব।” ময়ূখ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনার উপরে কে অত্যাচার করিয়াছে?”
 “পর্তুগীজ বণিক্ অথবা দস্য।” “পর্তুগীজ বণিক্ কি দস্য?” “ইহারা যখন স্ত্রবিধা পায় তখন বাণিজ্য করে এবং যখন অবসর বুঝে তখন লুণ্ঠ তরাজ করে।” “ফৌজদার ইহাদিগকে শাসন করেন না কেন?” “পারেন না বলিয়া।” “স্ববাদার কি এ সকল কথা জানেন না?” “ভিতরে আসুন বলিতেছি।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অতিথি-পরিচয়

“ঠাকুর, আমি ঢাকা হইতে ফিরিতেছি, বাঙ্গালার স্ববাদের দরিদ্র প্রজাকে দস্যুর অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে অক্ষম।” “তবে বাদশাহের নিকটে আবেদন করুন।” “ঠাকুর, আমি বণিক্, ফিরিঙ্গির অত্যাচারে আমার সর্বস্ব গিয়াছে। যাহা কিছু আছে দিল্লী গেলে তাহাও যাইবে।” “কেন, বাদশাহ কি তাহা কাড়িয়া লইবেন?” “না, তবে আমি বাদশাহের দরবারে পৌছিবার পূর্বে ফিরিঙ্গি বণিক্ এবং খৃষ্টান পাদরী আমার অবশিষ্ট সম্পত্তি এমন কি স্ত্রী, পুত্র, পর্যন্ত হরণ করিবে।”

ময়ূখ বিস্মিত হইয়া প্রৌঢ়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, —কণকাল পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয়! আপনি কে?” প্রৌঢ় দ্বিধা হাসিয়া কহিলেন, “ঠাকুর, আপনি নিজ পরিচয় গোপন করিয়াছেন—কিন্তু আমি তাহা করিব না। আমি সপ্তগ্রামবাসী স্ববর্ণবণিক্, বাণিজ্য আমার ব্যবসা, আমার নাম—গোকুলবিহারী সেন। সপ্তগ্রামে, গৌড়ে, স্ববর্ণগ্রামে ও ঢাকায় আমার কুঠী আছে। পূর্বে আমার দশখানি জাহাজ ছিল, সেগুলি একে একে বিসর্জন দিয়াছি। গৌড়ে ও ঢাকায়

ব্যবসা বাণিজ্য অচল এবং সপ্তগ্রামে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।” ময়ূখ কহিলেন, “মহাশয়, আমার নাম ময়ূখ, আমার পিতা উত্তর রাঢ়ে একজন প্রসিদ্ধ ভূস্বামী ছিলেন। বাদশাহের আদেশে, আমার শৈশবে, পিতৃব্য সে অধিকার পাইয়াছেন, আমি একা সম্বলহীন ভিখারী। আপনার দশখানি জাহাজ ছিল, তাহা বিসর্জন দিলেন কেমন করিয়া?” “পর্তুগীজ বণিক তাহার কতকগুলি ডুবাইয়া দিয়াছে এবং অবশিষ্টগুলি কাড়িয়া লইয়াছে।” “ইহার কি প্রতিকার নাই?” “অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিলাম—কিন্তু কোন ফল হইল না—” “এখন কি করিবেন?” “আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিব।” “স্ববাদার ফৌজদার যাহাদিগের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারেন না, আপনি একা তাহাদিগের সহিত কি করিয়া লড়াই করিবেন?” “আমার কিঞ্চিৎ সৈন্যবল আছে এবং অগ্নি ফিরিঙ্গীরা আমাকে সাহায্য করিবে।” “ফিরিঙ্গী কি দুই তিন রকম আছে না কি?” ঠাকুর কি তাহা জানেন না? এখন যাহাদিগের প্রভাব অধিক তাহার। পর্তুগীজ; ইহাদিগের এক সন্ন্যাসী জল ও স্থলের রাজত্ব ইহাদিগকে লিখিয়া পড়িয়া দান করিয়াছেন, সেইজন্য ইহারা পৃথিবীর সর্বত্র অত্যাচার করিয়া বেড়ায়। অগ্ন্যাগ্নি ফিরিঙ্গীরা ইহাদের শ্রায় উদ্ধত নহে, তাহাদিগের মধ্যে ওলন্দাজ জাতি সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত। আংরেজ ও ফরাসী জাতি ক্রমে ক্রমে এদেশে বাণিজ্য বিস্তার করিতেছে, তাহাদিগের মধ্যে ফরাসী জাতি গুনিয়াছি বড়ই পরাক্রান্ত; কিন্তু এদেশে পরাক্রমের লক্ষণ

কিছু দেখিতে পাই নাই। অল্প ফিরিঙ্গী বণিকের সহিত কারবার করি বলিয়া পৰ্তুগীজ বণিক আমার উপর অসন্তুষ্ট। ইহারই জন্ত আমার জাহাজ মারা গিয়াছে, আমার সপ্তগ্রামের কুঠিতে আগুন লাগিয়াছে এবং সকল বিষয়ে আমার সৰ্বনাশের চেষ্টা হইতেছে।”

“অন্য ফিরিঙ্গীদের কোথাও কুঠী আছে?” “এদেশে নাই, কিছুদিন পূর্বে দুইজন ইংরাজ পাটনায় একটি কুঠী খুলিয়াছিল, কিন্তু সে কুঠী বোধ হয় উঠিয়া গিয়াছে। সকলেই সপ্তগ্রামে অথবা নিকটে কুঠী খুলিবার চেষ্টায় আছে, সপ্তগ্রামের বাজারে সকল ফিরিঙ্গীর গোমস্তা খরিদ বিক্রয় করিতে আসে। এখন কেহই পৰ্তুগীজ বণিকের সহিত পারিয়া উঠিতেছে না, তবে ওলন্দাজ ও আংরেজ একসঙ্গে মিশিলে বোধ হয় পৰ্তুগীজের প্রভাব কমিয়া যাইবে।”

“স্ববাদারের কাছে দরবার করিয়া কোন লাভ হইল না?” “না,—মোকরম খাঁ অত্যন্ত বিলাসী, পৰ্তুগীজ বণিকগণ নানা উপায়ে তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিয়াছে, সেইজন্য তিনি বাদশাহের নিকট প্রজা বা অন্য জাতীয় ফিরিঙ্গীর আর্জি পেশ করিতে দেন না।”

“পৰ্তুগীজদিগের সহিত লড়াই আরম্ভ করিলে স্ববাদার কি অসন্তুষ্ট হইবেন না?” “হয়ত হইবেন। কিন্তু স্ববাদারকে সন্তুষ্ট করিতে হইলে আমাকে সবংশে মরিতে হইবে।” “তবে কি করিবেন? স্বয়ং স্ববাদার যদি ফিরিঙ্গীর সহিত যোগ দেন

তাহা হইলে কতক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিবেন?” “দেখি নারায়ণ কি করেন? ঠাকুর, আপনি কি করিবেন?” “মহামায়া আমাকে আপনার আশ্রয়ে পৌছাইয়া দিয়াছেন, আপনি আমাকে যাহা করিতে বলিবেন তাহাই করিব।” “দেখুন, পৰ্তুগীজ বণিক্ অপেক্ষা পৰ্তুগীজ পাদরী আরও ভয়ানক। আপনার আত্মা পাদরীর হাতে পড়িলে তাহাকে উদ্ধার করা কঠিন হইবে।” “আমরা কি কল্য সপ্তগ্রামে পৌছিব?” “না, এখান হইতে সপ্তগ্রাম দুই দিনের পথ, সাধারণ নৌকা সপ্তাহের পূর্বে পৌছিতে পারিবে না।” “ফিরিঙ্গীদের কোশা কয়দিনে পৌছিবে?” “দিবরাত্রি চলিলে কল্য সন্ধ্যাকালে বন্দরে পৌছিবে।” “আমরা একদিন পরে পৌছিব, তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না ত?” “বোধ হয় না।” “সপ্তগ্রামে কে কে আপনার বন্ধু আছেন?”

“বন্দরের মুন্সী হাফিজ আহমদ খাঁ, নাওয়ারার মীর আতেশ এনায়েৎ উল্লা খাঁ, খালিশা মহলের নায়েব দেওয়ান চিস্তামনি মজুমদার এবং ফৌজদারের খাজাঞ্চি হরিনারায়ণ শীল।” “চিস্তামনি মজুমদার ও হরিনারায়ণ শীল এখনও সপ্তগ্রামে আছেন। দুই বৎসর পূর্বে হাফিজ আহমদ খাঁর মৃত্যু হইয়াছে এবং এনায়েৎ উল্লা খাঁ জহাঙ্গীর নগর গিয়াছেন। ফৌজদারের সহিত কি আপনার পরিচয় আছে?” “না, তবে সুলতান সাজাহানের সহিত যখন উড়িষ্যার নায়েব নাজিম আহমদ বেগখাঁর যুদ্ধ হইয়াছিল, তখন পিতা ও কলিমুল্লা খাঁ

পিপলি হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত এক সঙ্কে ছিলেন, আকবর নগর ও জহাঙ্গীর নগরের যুদ্ধে পিতা আহামদ বেগ খাঁর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। নাওয়ারার কোন কর্মচারী কি এখন সপ্তগ্রামে আছেন ?” “আছেন ; আমীরউলবহর আসদ খাঁ কিছুদিন পূর্বে সপ্তগ্রামে আসিয়াছেন।”

“বড়ই সৌভাগ্যের কথা, আসদখাঁও আমার পিতৃবন্ধু, মহবৎখাঁ ও খানাজদখাঁর সুবাদারীর সময়ে পিতা বহুদিন আসদখাঁর সহিত একসঙ্গে বিদ্রোহদমন কার্যে নিযুক্ত ছিলেন।” “সুবাদারের কর্মচারীদের মধ্যে কাহারও সহিত আলাপ আছে কি ?” “নায়েব কানুনগো ভগবান্ রায় পিতার বন্ধু, আর কাহারও নাম স্মরণ নাই।” “অনেক রাত্রি হইয়াছে, বিশ্রাম করুন, সপ্তগ্রামে পৌছিয়া পরামর্শ করা যাইবে।”

গোকুল, গোষ্ঠ ও ময়ূখ কক্ষমধ্যে শয়ন করিলেন। রাত্রি শেষে নৌকা থামিল, কেনারাম আসিয়া গোকুলকে জাগাইল এবং কহিল, “হজুর, সম্মুখে অনেক নৌকা দেখা যাইতেছে, সমস্তই গল্পার ও কোশা। একখানা পঞ্চাশ তোপের গরার ঠিক গঙ্গার মাঝখানে নোঙ্গর করিয়া আছে, নৌকা কি চালাইব ?”

গোকুল, গোষ্ঠ ও ময়ূখ নৌকার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং দেখিলেন যে, নৌবাহিনীর আলোকমালায় অন্ধকার গঙ্গাবক্ষ দিনের ত্রায় উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। তাহা দেখিয়া

গোকুলবিহারী কহিলেন, “বোধ হয়, বাদশাহী বহর; কেনা-রাম, তুমি ধীরে ধীরে ছিপ বাহিয়া গরারের নিকট চল।” ছিপ ধীরে ধীরে চলিল। গরারের শত হস্ত দূরে পৌঁছিলে গরারের উপর হইতে শাস্ত্রীপাহারা হাঁকিল, “নৌকা তফাৎ, কাহার ছিপ?” ছিপ হইতে গোকুলবিহারী কহিলেন, “সপ্তগ্রামের বণিক্ গোকুলবিহারী সেনের ছিপ, সপ্তগ্রামে যাইব।” “কোথা হইতে আসিতেছ?” “জহাঙ্গীর নগর হইতে।” “ছাড় আছে?” “আছে।” “দাঁড়াও।”

গরাব হইতে একখানি ছোট নৌকা আসিয়া ছিপে লাগিল, একজন নাখোদা আসিয়া জহাঙ্গীরনগর বন্দরের ছাড়পত্র দেখিয়া পুনরায় ফিরিয়া গেল। ক্ষণকাল পরে গরার হইতে শাস্ত্রী হাঁকিয়া কহিল, “ছিপ চালাও, কিন্তু খবরদার ফিরিঙ্গিদের একখানি কোশা এই পথে গিয়াছে।” নৌকার উপরে দাঁড়াইয়া গোকুলবিহারী কহিলেন, “তাহার জন্ত চিন্তা নাই।” ছিপ বহর পার হইয়া নবদ্বীপাভিমুখে চলিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আশিক ও মানুষক

মুক্তবেণীতে সরস্বতী ও গঙ্গাসঙ্গমের নিকটে একটি তিস্তিড়ি বৃক্ষতলে বসিয়া একটি যুবক একমনে গঙ্গা-প্রবাহে অসংখ্য নৌবাহিনীর সম্মিলন দেখিতেছিল। সরস্বতী তখন প্রায় বিগতযৌবনা, কিন্তু তথাপি বর্তমান সময়ের গ্রায় কঙ্কাল-বশিষ্টা হয় নাই। তখনও চারি পাঁচ হাজার মনের নৌকা স্বচ্ছন্দে হিজলি হইতে সপ্তগ্রামে আসিত এবং বৎসরের বার-মাস নদীতে নৌকা চলিত। সরস্বতীর মোহানায় ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেকগুলি নৌকা ভাঁটার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, তাহার মধ্যে দুই একখানি বজ্রাও ছিল। একখানি বজ্রার কামরার সম্মুখে দুইটি মুসলমান রমণী বসিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে একজন যুবতী ও রূপসী, অপরা প্রৌঢ়া ও কুরুপা। তাহাদিগের পোষাক পরিচ্ছদ দেখিলে বোধ হয় যে তাহারা সম্ভ্রান্তবংশীয়া, অথচ তাহারা নর্ত্তকী; কারণ কোন মুসলমান কুলবধু দিবসে জনসমাজে বাহির হয় না। রূপসী কুরুপাকে কহিল, “ফতেমা, ঐ তিস্তিড়ি বৃক্ষতলে যে কাফের যুবক বসিয়া আছে, যদি তাহাকে পাই তবে বিবাহ করি।” প্রৌঢ়া বিরক্ত হইয়া কহিল, “তোমার বয়স হইয়াছে তথাপি গান্ধীর্ঘ্য আসিল না।

কি দুঃখে কাফেরকে বিবাহ করিতে যাইবে? কোন মুসলমানের ঘরে কি উপযুক্ত পাত্র নাই?” “হয়ত আছে। আমার মনে ধরিলে ত?” “এত যায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইলে, এত লোক দেখিলে, কাহাকেও কি, বাছা, তোমার মনে ধরিল না?” “ধরিয়াকে ত।” “কাহাকে?” “ঐ কাফের যুবককে।” “সে কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। মনের গত পাত্র কি স্থবাবাঙ্গালার মুসলমান সমাজে মিলিল না?” “না।” “ধন্য মন বটে!” “সে জিনিষটা এখন বেশ ভাল আছে, ফতেমা, তুই সেতারটা লইয়া আয়।”

“এই এত লোকের মাঝে, বজরার সম্মুখে বসিয়া, সেতার বাজাইবে? লোকে কি বলিবে?” “আমি কি স্থলতানা আরজগন্দ বাণু বেগম যে সারা হিন্দুস্থানের লোক আমাকে দূষিবে? আমি তওয়াইফের বেটী, আমার মা জহাজীর নগর হইতে লাহোর পর্যন্ত সারা হিন্দুস্থানটা নাচিয়া গাহিয়া বেড়াইয়াছে—”

“ছি মা, অমন কথা মুখে আনিতে নাই; তোমার মা স্বর্গে গিয়াছেন। তিনি তওয়াইফ ছিলেন বটে, কিন্তু কস্বী ছিলেন না।” “দূর, আমি কি তাই বলছি? মা ত পেশোয়াজ পরিয়া মজলিসে নামিত? তবে আমি যদি বজরার সম্মুখে সেতার বাজাই তাহাতে দোষ কি?” “তোমার সঙ্গে কথায় আঁটিয়া উঠিতে পারিব না, বাছা, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই কর।”

“এই বলিয়া ফতিমা সেতার আনিবার জন্ত উঠিয়া গেল। বজ্রার ছাদে একজন বৃদ্ধ মুসলমান বসিয়াছিল; যুবতী তাহাকে ইমারা করিল, সে নামিয়া আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। যুবতী কহিল, “হবিব, ঐ তিস্তিড়ি-বৃক্ষ-তলে যে কাফের যুবা বসিয়া আছে, গোপনে উহার পরিচয় জানিয়া আইস। খবরদার আমাদের পরিচয় দিও না।” বৃদ্ধ সেলাম করিয়া বজরা হইতে নামিয়া গেল। এই সময়ে ফতিমা সেতার লইয়া ফিরিয়া আসিল, যুবতী সেতার লইয়া স্তর বাঁধিতে বসিল। স্তর বাঁধা শেষ হইলে, যুবতী নয়নকোণে চাহিয়া দেখিল যে, হবিব, তিস্তিড়ি-বৃক্ষতলে যুবকের পার্শ্বে গিয়া বসিয়াছে। যুবতীর তাম্বুলরঞ্জিত কুসুমপেলব অধরে ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা দিয়া আবার মিলাইয়া গেল। যুবতী সেতার উঠাইয়া লইয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল। তখনও দিবসের প্রথম প্রহর অতীত হয় নাই। যুবতী ভুলক্রমে পূর্ববী আলাপ করিতে আরম্ভ করিল, ভুল বুঝিতে পারিয়া তাহা ছাড়িয়া দিল। গজদন্তনির্মিত ক্ষুদ্র সেতারে সিদ্ধুর একটা মিঠা গং বাজিতেছিল। সেকালে সপ্তগ্রামে সমজদারের অভাব ছিল না, দেখিতে দেখিতে নদীতীরে লোক জমিয়া গেল, যুবতী সেতারের অন্তরাল হইতে চাহিয়া দেখিল, কাফের যুবা একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। গোলাপের ত্রায় স্তম্ভর অধরে আবার হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, যুবতী সেতার রাখিয়া কামরায় প্রবেশ করিল। তীরে ও নদীর জলে নৌকায় নৌকায় লোকে

স্বক হইয়া সেতারের আলাপ শুনিতেন ; সেতার থামিলে সকলে একসঙ্গে কথা কহিতে আরম্ভ করিল। কেহ বলিল, এ বাদশাহের বেটী, ফিরিঙ্গীরা ধরিয়া আনিয়াছিল, এখন প্রাণের দায়ে ছাড়িয়া দিয়াছে। আর একজন বলিল যে, এ ইরাণের তওয়াইফ, স্ববাদারের মজলিসে মজুরা করিতে যাইতেছে। এক বৃদ্ধ ফকির শ্রুত্রে অঙ্গুলী চালনা করিতে করিতে কহিল যে, রমণী নিশ্চয়ই পরীজাদী, আশমান ছাড়িয়া শীকারের চেষ্টায় ছনিয়ায় আসিয়াছে। এই অবসরে যুবার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হবিব কহিল, “বাবু সাহেব বোধ হয় সহরে নূতন আসিয়াছেন?” যুবা মুখ ফিরাইয়া দেখিল যে এক বৃদ্ধ মুসলমান তাহার পলাঙ-গন্ধযুক্ত মুখ ও মেহেদীসংযুক্ত শ্রুত্রে তাহার মুখের নিকটে লইয়া আসিয়া প্রচুর পরিমাণে নিষ্ঠীবন বর্ষণ করিতেছে। যুবা বিরক্ত হইল ; কিন্তু বুড়া এমনই মোলায়েম কায়দার সহিত কথা কয়টি বলিয়াছিল যে, বিরক্তি প্রকাশ করিতে যুবক লজ্জা বোধ করিল। সে কহিল, “হাঁ।” তখন বৃদ্ধ এক দীর্ঘ সেলাম করিয়া কহিল, “বাবু সাহেব সম্ভ্রান্তবংশজাত, মুখ দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। বাবু সাহেব বোধ হয় ভ্রমণ করিতে আসিয়াছেন? সপ্তগ্রাম বড় আজব সহর, এমন সহর গোড় ছাড়া স্ববাবাঙ্গালায় আর নাই।” যুবা কি বলিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না। এই বৃদ্ধ কে? সে সহসা দয়াপরবশ হইয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে আসিল কেন? যুবা যখন এই চিন্তা করিতেছিল, তখন বুড়া পুনরায় অজ্ঞাসা করিল, “বাবু

সাহেব জাফর খাঁ গাজীর দরুগাহ্ দেখিয়াছেন কি ? এমন খুবসুরত ইমারৎ হিন্দুস্থানে অল্পই আছে ।” যুবা ধীরে ধীরে কহিল, “না ।”

“তবে চলুন, আপনাকে দেখাইয়া আনি ।” যুবা তাহার আকস্মিক দয়ার কারণ বুঝিতে না পারিয়া কহিল, “চলুন ।” উভয়ে তিস্তিড়ি বৃক্ষের পশ্চাতে অবস্থিত পাষাণনির্মিত সমাধি-মন্দিরে প্রবেশ করিল ।

বজরার গবাক্ষ হইতে যুবতী তাহা দেখিল । সে তাহার সঙ্গিনীকে কহিল, “ফতেমা, নাজির আহমদ কি নৌকায় আছে ?” ফতেমা কহিল, “খাঁ সাহেব বোধ হয় বাজারে গিয়াছেন, ঠিক বলিতে পারি না, দেখিয়া আসি ।” ফতেমা বজরার বাহিরে আসিয়া দেখিল যে, বজরার পশ্চাতে একখানি পানুসীর উপরে দাঁড়াইয়া একজন প্রৌঢ় ফর্শীতে তামাকু সেবন করিতেছে । প্রৌঢ় তাহাকে কহিল, “খাঁ সাহেব, বিবি আপনাকে তলব করিয়াছেন ।” প্রৌঢ় তাহা শুনিয়া ফর্শী নামাইয়া রাখিল এবং কহিল, “ফতেমা বিবি, সাহেবা বুঝি চটিয়াছেন, কল্যা ত্রিভিতে সেতোরের মেজরাপ্ খরিদ করিতে হুকুম করিয়া-ছিলেন, আমি সন্ধ্যাবেলায় আফিম্ টানিয়া তাহা বিলকূল ভুলিয়া গিয়াছি । বিবির হাতে সেতার দেখিয়া ডিঙ্গার ভিতরে লুকাইয়া ছিলাম । খোদা তালার কসম বিবিজান, আজ সকালে সাহেবার মেজাজটা কেমন বল দেখি ?” ফতেমা হাসিয়া কহিল, “খাঁ সাহেব, তোমার নসিবে আজ দুঃখ নাই । মেজাজ বড়ই

খোস, বিবির প্রাণে এখন আশিক্ জাগিয়াছে। তুমি শীঘ্র আইস।” খাঁ সাহেব দাড়ী গোঁফ্ চোমরাইয়া লইয়া বজরায় উঠিয়া কহিল, “ফতেমা বিবি, তুমি তবে এতলা দিয়া আইস।” প্রোটা কহিল,—“এতলা দিতে হইবে না, তুমি যাও।” বজরার প্রথম কক্ষের দ্বারে কিংখাবের পর্দা উঠাইয়া খাঁ সাহেব কামরায় প্রবেশ করিল। যুবতী তখন বজরার বাতায়নের পার্শ্বে বসিয়া একখানি পত্র লিখিতেছিল; তাহা দেখিয়া খাঁ সাহেব সেলাম করিয়া দু’য়ারে দাঁড়াইয়া রহিল। পত্র লেখা শেষ হইল, যুবতী তাহা কুন্দদন্তে টিপিয়া ধরিয়া লেফাফায় বন্ধ করিল এবং দ্বিরদরদখচিত অপূর্ব কোটা হইতে গালা ও মোহর বাহির করিল; তাহা দেখিয়া খাঁ সাহেব কক্ষান্তর হইতে প্রজ্জলিত বর্তিকা লইয়া আসিল। পত্র মোহর করিয়া যুবতী তাহা খাঁ সাহেবের হস্তে দিল এবং কহিল, “গোকুলবিহারীর কুঠী হইতে এক হাজার আসবুফী লইয়া আইস। আর দেখ অতাই একটা বাটি ভাড়া করিয়া আইস, আমি আকবরনগর যাইব না, সপ্তগ্রামেই থাকিব।” খাঁ সাহেব সেলাম করিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিল।

হবিব যুবককে সঙ্গে লইয়া জাফরখাঁর কবর, মসজিদ, মদরসা প্রভৃতি দেখাইয়া তিস্তিড়ি বৃক্ষতলে ফিরাইয়া আনিল। যুবক তাহাকে কিছু অর্থ দিতে চাহিল; কিন্তু বৃদ্ধ তাহা কোন মতেই গ্রহণ করিল না। সে কহিল, “হজুর ঠিকানা দিয়া যাউন, আমি কল্য প্রাতে দুয়ারে হাজির থাকিব এবং ষরমায়েস

মত হুজুরকে সহর দেখাইতে যাইব।” যুবা তাহাকে নিরস্ত করিতে বহু চেষ্টা করিল, কিন্তু বৃদ্ধ তাহা শুনিল না। তখন যুবা বাধ্য হইয়া কহিল, “আমি মীনাবাজারে গোকুলবিহারী সেনের গৃহে থাকি, আমার নাম ময়ূখ।” বৃদ্ধ তাহা শুনিয়া যুবকের মুখে প্রচুর পরিমাণে নিষ্কপ করিতে করিতে কহিল, “তোফা বাবুসাহেব, বড় সুন্দর নাম, খোদাতালা আপনাকে যেমন খুবস্বরত দিয়াছেন, নামটিও তেমনই সুন্দর। আমি কল্য প্রাতে হুজুরের দৌলতখানায় হাজির থাকিব।” বৃদ্ধ প্রস্থান করিল।

ময়ূখ যতক্ষণ হবিবের সহিত কথা কহিতেছিলেন, ততক্ষণ আর একখানি নৌকা হইতে জর্নৈক দীর্ঘাকার ব্রাহ্মণ তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছিল। হবিব চলিয়া গেলে ময়ূখ নদীর দিকে ফিরিলেন, তখন ব্রাহ্মণ তাঁহার মুখ দেখিতে পাইলেন। তিনি হুই তিন বার ডাকিলেন, কিন্তু ময়ূখ তাহা শুনিতে পাইলেন না। ব্রাহ্মণের নৌকা দূরে ছিল, তাহা ভিড়াইতে ভিড়াইতে ময়ূখ প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণ কূলে উঠিয়া আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পতিতোকারে বাধা

সপ্তগ্রামে পৌছিয়া ময়ূখ নিত্য প্রভাতে একবার বন্দরে আসিতেন। তাঁহার মনে হইত যে হয় ত ভীমেশ্বর হইতে কেহ না কেহ তাঁহার সন্ধান করিতে আসিবে, কারণ ভুবন ফিরিয়া গিয়াছে। আর কেহ আসুক আর না আসুক ভুবন যে আসিবে সে বিষয়ে তাঁহার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। সেই জন্য তিনি প্রভাতে একবার করিয়া বন্দর অর্থাৎ সরস্বতী ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে আসিতেন। গৌরীপুরে ও ভীমেশ্বরে তাঁহার পিতার সভাপণ্ডিত জগদীশ তর্করত্ন তাঁহার সাহায্যের জন্য যে বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন, তিনি তাহার কিছুই জানিতেন না।

দিবসের দ্বিতীয় প্রহর আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া ময়ূখ বন্দর হইতে দ্রুতপদে গৃহে ফিরিতেছিলেন। গৌকুলবিহারীর গৃহ হইতে সপ্তগ্রামের বন্দর প্রায় দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত, নগরের পথে ভীষণ জনতা, দ্রুতপদে চলা অসম্ভব, তথাপি ময়ূখ যথাসম্ভব দ্রুতবেগে চলিতেছিলেন। বন্দরের বাজার পার হইয়া ময়ূখ সপ্তগ্রাম দুর্গের নিম্নে উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান দুর্গদ্বার হইতে নির্গত হইয়া

ময়ূখের সঙ্গে চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ময়ূখ দেখিতে পাইলেন যে একটি গৃহের সম্মুখে তিনজন ফিরিঙ্গি দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদিগের মধ্যে একজন কৃষ্ণবস্ত্রাবৃত ও অপর দুইজন সাধারণ সেনা। গৃহের সম্মুখে বসিয়া একজন যুবক কাতর কণ্ঠে কহিতেছে যে, সে হিন্দু, সে খৃষ্টান হয় নাই এবং হইবে না; সে ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণবসনপরিহিত ফিরিঙ্গীর পদযুগল ধরিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য মিনতি করিতেছে। ফিরিঙ্গি বলিতেছে যে সে কল্যা খৃষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে, গৃহে থাকিলে তাহার আত্মীয় স্বজন দীর্ঘ অনরকবাসের পথ স্বগম করিয়া দিবে, সেইজন্য তাহাকে হুগলী যাইতে হইবে। এই সময়ে ময়ূখ ও তাহার মুসলমান সঙ্গী সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। মুসলমান ফিরিঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হইয়াছে?” ফিরিঙ্গী কহিল, “আমি ধর্মযাজক, এই হিন্দু কল্যা পবিত্র খৃষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার আত্মীয় স্বজনের পরামর্শে অদ্য পলাইয়া আসিয়াছে। সেই জন্য আমি তাহাকে হুগলীতে লইয়া যাইতে আসিয়াছি।” মুসলমান যুবককে জিজ্ঞাসা করিল, “হিন্দু, তুমি ইসাই হইয়াছ?” যুবা মুসলমানের পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া কহিল, “দোহাই হুজুরের, হিন্দু ও মুসলমানের ঈশ্বরের দিব্য আমি খৃষ্টান হই নাই। এই পাত্রী আমাকে জোর করিয়া খৃষ্টান করিতে চাহিয়াছিল বলিয়া আমি হুগলী হইতে সপ্তগ্রামে পলাইয়া আসিয়াছি।”

“পাদ্রী কি মিথ্যা কথা বলিতেছে?” “হাঁ। হুজুর আমাকে রক্ষা করুন।”

তখন মুসলমান পাদ্রীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “ফিরিজ্জি, হিন্দু যাহা বলিল তাহা শুনিলে? তুমি বল প্রয়োগ করিও না, কাজীর নিকটে যাও, এই হিন্দুর উপরে যদি তোমার অধিকার থাকে, তাহা হইলে, কাজী ইহাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিবেন।” পাদ্রী উদ্ধত ভাবে কহিলেন, “আমরা কাজীর বিচারাধীন নহি। এই হিন্দু খৃষ্টান হইয়াছে, আমি এখনই ইহাকে ছগলী লইয়া যাইব।”

“ইহা শাহান শাহ বাদশাহের এলাকা ফিরিজ্জি,—এখানে, বল প্রয়োগ করিলে তুমি দণ্ডনীয় হইবে।” “আমাকে দণ্ড দিবার ক্ষমতা তোমার বাদশাহের পিতৃপিতামহেরও নাই। তুমি অধিক কথা কহিলে তোমাকে চাবুক লাগাইব।”

ক্রোধে মুসলমানের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, সে নিজের কটিবন্ধ স্পর্শ করিয়া দেখিল যে তাহাতে কোন অস্ত্র নাই। তখন মুসলমান চাহিয়া দেখিল, তাহার সহযাত্রী হিন্দু যুবা তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মুহু মুহু হাসিতেছে। মুসলমান পুনরায় পাদ্রীকে কহিল, “ফিরিজ্জি তোমার অপরাধ মার্জনা করিতেছি। শাহনশাহ বাদশাহের নামে কুৎসিত ভাষা ব্যবহার করিলে হিন্দুস্থানের আইন অনুসারে শূলে যাইতে হয়। তুমি বিদেশীয়, সম্ভবতঃ আইন কানুন জান না। এই দণ্ডে সপ্তগ্রাম পরিত্যাগ কর নতুবা মরিবে।” ফিরিজ্জি ক্রোধে জ্ঞানশূণ্য হইয়া কহিল,—

“তোমার মত বিধর্মী কুকুরকে আমরা কারাগারে রাখিয়া শূকর মাংস ঝাইতে দিই।” মুসলমান অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, “ফিরিজি, তোমার কি মরিতে ইচ্ছা হইয়াছে?” উত্তরস্বরূপ পাদ্রী মুসলমানের অশ্রু ধরিয়া আকর্ষণ করিলেন, মুসলমান কিন্তু হইয়া পাদ্রীর প্রশস্ত গণ্ডস্থলে এক বিরাট চপেটাঘাত করিল, স্থূল ক্ষুদ্রকায় লম্বোদর পাদ্রী আঘাতের বেগ সহিতে না পারিয়া গড়াইয়া পড়িল। ফিরিজি সেনাদ্বয় তৎক্ষণাৎ মুসলমানকে আক্রমণ করিল। তখন ময়ূখ একজনের পশ্চাদ্দেশে ভীষণ বেগে পদাঘাত করিলেন, ফিরিজি তাহার ফলে ভূমি হইতে উঠিয়া পাঁচ হাত দূরে গিয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া তাহার সঙ্গী মুসলমানকে ছাড়িয়া বন্দুক ধরিল। পথে অনেক লোক দাঁড়াইয়া-ছিল, তাহারা বন্দুক দেখিয়া উল্লসাসে পলায়ন করিল। এমন কি, যে হিন্দু যুবার উদ্ধারের জন্য মুসলমান পাদ্রীর সহিত বিবাদ করিয়াছিল সেও গৃহে প্রবেশ করিয়া কবাট রুদ্ধ করিয়া দিল। ফিরিজি বন্দুক ছুড়িল, ময়ূখ পাশ কাটাইয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং নিমেষের মধ্যে মুসলমানকে টানিয়া লইয়া পথি-পার্শ্বের এক অশ্বখ বৃক্ষের আশ্রয় লইলেন। দ্বিতীয় ফিরিজির বন্দুকের গুলি তৎক্ষণাৎ আসিয়া বৃক্ষকাণ্ডে বিদ্ধ হইল। ময়ূখ তখন বজ্রাভ্যন্তর হইতে রজত নির্মিত একটি ক্ষুদ্র বন্দুক বাহির করিল। মুসলমান তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “ইহা কি?” ময়ূখ বন্দুকটি একজন ফিরিজী সেনার দিকে ধরিয়া কহিলেন, “ইহা নূতন ধরণের বন্দুক, ইহার নাম পিস্তল।”

তখন বিলাতে পিস্তলের ব্যবহার অল্পদিন আরম্ভ হইয়াছে, একটি দুইটি মাত্র হিন্দুস্থানে আসিয়াছে। পিস্তলের আওগাজ হইল, একজন ফিরিজি আহত হইয়া পড়িয়া গেল ; তাহা দেখিয়া পাত্রী ও দ্বিতীয় ফিরিজি দূরে আর এক বৃক্ষকাণ্ডের পার্শ্বে আশ্রয় লইল। ময়ূখ ছুটিয়া বাহির হইয়া আহত ফিরিজির বন্দুক কাড়িয়া লইয়া পুনরায় বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময়ে দ্বিতীয় ফিরিজির বন্দুকের আর একটা গুলি আসিয়া তাঁহার বামহস্তে বিদ্ধ হইল। ময়ূখ তাহা গ্রাহ্য না করিয়া মুসলমানকে কহিলেন, “আপনার বন্দুক ধরা অভ্যাস আছে ?” মুসলমান হাসিয়া কহিল, “আছে, আমি যুদ্ধ ব্যবসায়ী।” মুসলমান বন্দুক হাতে লইয়া কহিল, “গুলি ও বারুদ কই ?” ময়ূখ কহিলেন, “অপেক্ষা করুন লইয়া আসি।” মুসলমান তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া কহিল, “কাফের, তুমি আহত হইয়াছ, এই বার আমার পালা। ফিরিজি যদি মূখ বাড়ায় তাহা হইলে গুলি চালাইও। যদি আমি মরি তাহা হইলে ফৌজদার কলিমুল্লা খাঁকে বলিও যে জহাঙ্গীরী আমলের একজন আমীর ফিরিজির হাতে মরিয়াছে।” মুসলমান উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ছুটিয়া বাহির হইল ; তাহা দেখিয়া ফিরিজি যেমন মুখ বাড়াইল অমনই ময়ূখের পিস্তলের গুলি তাহার ললাটে বিদ্ধ হইল। তখন হিন্দুর পরিত্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া স্থলকায় লম্বোদর পাত্রী হুগলীর দিকে পলায়ন করিল।

যুদ্ধ শেষ হইয়াছে দেখিয়া ময়ূখ বৃক্ষকাণ্ডের আশ্রয় পরি-

ত্যাগ করিয়া মুসলমানকে কহিলেন, “সাহেব, এখন আপনি নিশ্চিন্ত মনে গমন করুন, আমি গৃহে চলিলাম।” মুসলমান বন্দুকে বারুদ ভরিতে ভরিতে কহিলেন, “কাফের, তুমি বীর, অতু তুমি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ; স্বতরাং তুমি আমার দোস্ত। তোমাকে এখন ছাড়িব না, তুমি আমার সহিত কিল্লায় ফিরিয়া চল। তুমি ফিরিজির রক্তপাত করিয়াছ, সুবা বান্ধালা তোমার পক্ষে নিরাপদ স্থান নহে। তুমি কে? কোথা হইতে আসিতেছ?” “সাহেব, বিশেষ কারণে আপনাকে পরিচয় দিতে পারিব না। ফিরিজি আমার দুশমন, তাহার। আমার এক আত্মীয়াকে হরণ করিয়া আনিয়াছে; আমি তাহারই উদ্ধারের চেষ্টায় সপ্তগ্রামে আসিয়াছি।”

“যুবক, আমি তোমার পিতার বয়সী, আমার নিকট সত্য গোপন করিয়া ভাল করিতেছ না। তুমি আমার জন্ত ফিরিজি হত্যা করিয়াছ, সুবা বান্ধালায় বাস করিতে হইলে, তোমাকে আমার সহিত বাস করিতে হইবে। আমি বাদশাহী নাওয়ারার আমীর, আমার নাম আস্‌দু খাঁ।”

যুবা বিন্মিত হইয়া আমীরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, এবং ক্ষণকাল পরে কহিলেন, “খাঁ সাহেব, আপনি আমার পিতৃবন্ধু, আপনার নিকট পরিচয় গোপন করিব না। আমার নাম ময়ূখ, পরগণা বারবক্‌ সিংহের ভূতপূর্ব জমীদার মহারাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় আমার পিতা—”

“তুমি দেবেন্দ্রনারায়ণের পুত্র! সপ্তগ্রামে আসিয়াছ,

আমাকে সংবাদ দাও নাই কেন? অল্পপনারায়ণ খানাজাদ্‌ খাঁর আমলে বারবক সিংহ বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে, তখন যদি তোমার তরফের কোন উকিল জহাঙ্গীর নগরে উপস্থিত থাকিত, তাহা হইলে তুমি তোমার পিতার জমীদারী পাইতে। তুমি এখন কি করিতেছ? ” “সাহেব, শৈশবে মাতৃহারা হইয়াছি, আমার ভ্রাতা ভগিনী কেহই নাই। পিতার মৃত্যুর সময়ে আমার বয়স মাত্র চতুর্দশ বৎসর ছিল, তখন খুড়া মহাশয় গোপনে বাদশাহের সনন্দ আনাইয়া সম্পত্তি দখল করিয়াছেন। পিতার মৃত্যুর পরে চারি বৎসর শাস্ত্র ও শস্ত্র শিক্ষা করিয়াছি, ভাবিতেছিলাম জীবিকা অর্জনের চেষ্টায় বাহির হইব, এমন সময়ে ফিরিজির সহিত বিবাদ বাধিল। ”

ময়ূখ ললিতার হরণবৃত্তান্ত আমূল আসদ্‌ খাঁকে শুনাইলেন। ময়ূখ গোকুলবিহারীর আশ্রয় পাইয়াছেন শুনিয়া আসদ্‌ খাঁ সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, “উত্তম করিয়াছ, গোকুলের গ্রাম পরাক্রান্ত হিন্দু সপ্তগ্রামে কেহ নাই। কিন্তু তুমি এখন একাকী মীনাবাজারে ফিরিতে পাইবে না। আমার সহিত কিল্লায় চল, সেখান হইতে সঙ্গে পাহারা দিয়া পাঠাইয়া দিব। ”

ময়ূখ ও আসদ্‌ খাঁ কিল্লায় ফিরিলেন। ফৌজদার কলিমুল্লা খাঁ আহাৱান্তে অহিফেণ সেবন করিয়া ঝিমাইতেছিলেন; ময়ূখকে আসদ্‌ খাঁ লইয়া ফৌজদারের বারদুয়ারীতে প্রবেশ করিলেন। ভয় পাইয়া বুড়া ফৌজদার চৌকি হইতে পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেল। আসদ্‌ খাঁ প্রবেশ করিয়াই কহিলেন, “খাঁ সাহেব,

এখনই একদল আহদী ও দশটা ভারি তোপ বন্দেলের পথে পাঠাইয়া দাও।” বৃড়া আফিম্‌চী কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, “যো হুকুম খোদাবন্দ, কি হইয়াছে?”

“শাহনশাহ বাদশাহ দীন ও ছুনিয়ার মালিক নূরুদ্দিন জহাঙ্গীর বাদশাহের রাজ্যে প্রকাশ পথে দিনের আলোকে ফিরিঙ্গি আমার উপরে গুলি চালাইয়াছে।” বৃদ্ধ ফৌজদার কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সপ্তগ্রামের যুদ্ধ

সন্ধ্যা আগত প্রায়, পশ্চিমে আত্মপণসের কুঞ্জে ভগবান্ মরীচিমালী আশ্রয় লাভ করিয়াছেন, বিশাল সপ্তগ্রাম নগরের অসংখ্য পথে সহস্র সহস্র দৌপ জলিয়া উঠিয়াছে। একটি প্রশস্ত রাজপথের পার্শ্বে দ্বিতল অট্টালিকার উপরে বারাণ্ডায় বসিয়া আমাদের পরিচিতা যুবতী সেতার বাজাইতেছিলেন, তাহার পার্শ্বে একখানি গালিচার উপরে বসিয়া ফতেমা চাঁদির বাঁটা লইয়া পান সাজিতেছিল এবং নাজীর আহমদ্ সজ্জত করিতেছিল; বারাণ্ডার এক কোণে দাঁড়াইয়া বৃড়া হবিব চাঁদির কলিকায় ফুঁ দিতেছিল। পুরবী কেদারা পুরিয়া ও গৌরী

দুই তিন বার বাজিয়া গেল। অন্ত দিন সপ্তগ্রাম সহরের মধ্যস্থলে প্রকাশ্য রাজপথে রূপসী যুবতীর সেতারের আওয়াজ শুনিলে লোক জমিয়া যাইত; কিন্তু আজি সপ্তগ্রামের পথে অসম্ভব জনতা, নগরের চারিদিক হইতে ভীষণ কোলাহল উত্থিত হইতেছে, সেতারের মিঠা আওয়াজ কাহারও কাণে পৌঁছিতেছে না। কোলাহল ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল, যুবতী বিরক্ত হইয়া সেতার রাখিল। এই সময়ে ভীষণ কোলাহল ভেদ করিয়া “ফিরিজি আসিল, ফিরিজি আসিল, বাজার লুটবে” শব্দ উঠিল। দোকানদারগণ দোকানপাট বন্ধ করিতে আরম্ভ করিল। ফিরিজি আসিতেছে শুনিয়া যুবতী, ফতেমা ও নাজীর আহমদ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল; সহসা নাজীর আহমদ বলিয়া উঠিল, “বিবি সাহেব, সর্বনাশ হইয়াছে, আমার ত আফিম ফুরাইয়াছে, আমাকে এখনই একবার বাজারে যাইতে হইবে।” যুবতীর মুখ শুকাইয়া গেল, সে কহিল, “সে কি নাজীর? এই হাঙ্গামার মধ্যে আমাদের ফেলিয়া কোথায় যাইবে?” বুড়া হাতযোড় করিয়া কাতর কণ্ঠে কহিল, “দোহাই বিবি সাহেব, বুড়া মাহুষ আফিম না পাইলে এখনই মরিয়া যাইব, দোকান পাট সব বন্ধ হইয়া গেল।” বুড়া বারাণ্ডার ছয়ারের দিকে অগ্রসর হইল, তাহা দেখিয়া যুবতী তাহার হাত ধরিল এবং কাতর কণ্ঠে কহিল, “নাজীর, এমন সময়ে আমাদের একা ফেলিয়া যাইও না।” সে শব্দ পাছে তাহার কর্ণে প্রবেশ করে সেই ভয়ে বৃদ্ধ কাণে আঙ্গুল দিয়া হাত ছাড়াইয়া পলাইল। তখন

যুবতী হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল। নগরের কোলাহল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে সপ্তগ্রামের অসংখ্য বিপণির সহস্র সহস্র দীপ নিবিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ নিঃশব্দে রোদন করিয়া যুবতী প্রোঢ়াকে কহিল, “ফতেমা, এখন কি করিব? কোথায় যাইব? কি উপায় হইবে?” ফতেমা কপালে করাঘাত করিয়া কহিল, “উপায় খোদার হাতে। তুমি কথা শুনিতে চাহ না, সপ্তগ্রামে না থাকিয়া আজি যদি জহাঙ্গীর নগরে যাইতে তাহা হইলে কি এ বিপদে পড়িতে?”

“তোমার কথা শুনিয়া আজ বজ্রা ছাড়িলে এতক্ষণ হুগলী বন্দরে গেরেফ্তার হইতাম।”

“তাহাও ত বটে।” হবিব্ এতক্ষণ নীরবে বসিয়াছিল, সে বলিয়া উঠিল, “বিবি সাহেব, বিপদের সময় কাঁদিলে কি ফল হইবে? আমি দুয়ারটা বন্ধ করিয়া আসি।” হবিব্ উঠিয়া গেল এবং ক্ষণকাল পরে একখানি পুরাতন মরিচাধরা তলোয়ার আনিয়া তাহাতে শাণ দিতে বসিল। যুবতী অশ্রুপূর্ণনেত্রে হাসিয়া কহিল “হবিব্, ভাঙ্গা তলোয়ার খানা কোথায় পাইলে?” হবিব্ গম্ভীর ভাবে কহিল, “আমার বাপ দাদার ছিল, আমার দাদা আকবর বাদশাহের ফৌজে আহদী ছিলেন।”

“তলোয়ার লইয়া কি করিবে?” “কাফের ফিরিজির সহিত লড়াই করিব।” “তুমি কি লড়াই করিতে জান?” “জানি না জানি, দুই একটার ত মাথা লইতে পারিব।”

“তাহারা যে বন্দুক লইয়া লড়াই করিবে?” “মরি স্বর্গে যাইব। বুড়া হবিব্ বাঁচিয়া থাকিতে তোমার গায়ে কেহ হাত দিতে পারিবে না।” “হবিব্, আমি নিজের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি।” “কি?”

যুবতী আঙ্গরাখার ভিতর হইতে একটি ছোট রূপার কোঁটা বাহির করিল। হবিব্ উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “উহাতে কি আছে?” যুবতী হাসিয়া কহিল, “জহর।” কতেনা শিহরিয়া উঠিল। এই সময় দূর হইতে বন্দুকের আওয়াজ আসিতে লাগিল, হবিব্ কহিল, “বিবি, আর বারান্দায় থাকিয়া কাজ নাই, ঘরের ভিতরে চল।” তিন জনে বারান্দা ত্যাগ করিয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন, হবিব্ সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া পুনরায় তলোয়ার শানাইতে বসিল।

ক্ষণকাল পরে দূর হইতে আর্ন্তনাদ শুনা গেল, ক্রমে তাহা নিকটে আসিতে লাগিল। সহসা কে অট্টালিকার দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিল। যুবতী বিষের কোঁটা বাহির করিল; কিন্তু কতেনা তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল। সেই সময়ে কক্ষের রুদ্ধদ্বার ভাঙ্গিয়া পাঁচ সাত জন ফিরিজি প্রবেশ করিল। হবিব্ তাহার ভাঙ্গা তলোয়ার হাতে করিয়া ফিরিজিদিগের সহিত লড়াই করিতে উত্তত হইল; কিন্তু একজন ফিরিজির সজিনের আঘাতে তাহার তলোয়ার ভাঙ্গিয়া গেল, দ্বিতীয় ফিরিজির বন্দুকের আঘাতে তাহার চেতনা লুপ্ত হইল, এবং

তৃতীয় ফিরিজি হবিবের হতচেতন দেহ পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করিল।

তখন ফিরিজিগণ যুবতী ও ফতেমাকে বন্ধন করিয়া লুণ্ঠনে মনঃসংযোগ করিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে তাহাদিগকে লইয়া অট্টালিকা পরিত্যাগ করিল। পথে সহস্র পুরুষ ও স্ত্রী বালক ও বালিকা ফিরিজিদিগের হস্তে বন্দী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; তাহাদিগের দুই দিকে বন্দুক হাতে শ্রেণীবদ্ধ ফিরিজি সেনা পাহারা দিতেছিল। ফতেমা ও যুবতী বন্দীদিগের নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। তখনও দূরে যুদ্ধ চলিতেছিল, মুহুমুহ বন্দুক ও কামানের আওয়াজ আসিতেছিল। একজন বৃদ্ধ সম্ভ্রান্ত মুসলমান যুবতীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাছা, তোমাকে রক্ষা করিবার কি কেহ ছিল না? এখন কথা কহিতে লজ্জা করিও না, আমি তোমার পিতার বয়সী, বিপদের সময় লজ্জা করিতে নাই।” যুবতী মুখ তুলিয়া কহিল, “পিতা, সংসারে আমার কোন অভিভাবক নাই, এক বৃদ্ধ পরিচারক ছিল, ফিরিজিরা তাহাকে মারিয়া আমাদের ধরিয়া আনিয়াছে।” বৃদ্ধ যুবতীর অসামান্য রূপলাবণ্য দেখিয়া কহিল, “মা, তোমার বয়স অল্প, তোমার দুর্ভাগ্যবশতঃ তোমার ঞ্চায় রূপ হিন্দুস্থানে বিরল, ফিরিজির হাতে তোমার অশেষ দুর্দশা হইবে। তুমি মুসলমানের কন্যা, মরিতে শিখিয়াছ কি?” যুবতী কহিল, “শিখিয়াছি, আমার পোষাকের মধ্যে জ্বর আছে, অবসর

পাই নাই বলিয়া খাইতে পারি নাই।” “যখন অবসর পাইবে খাইও, আর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহা হইলে আমার এই পুত্রবধূটিকে খাওয়াইও। আমার পুত্র আসদুখাঁর সহিত লড়াই করিতে গিয়াছে, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি তাহাকে রক্ষা করিতে পারি নাই।” বৃদ্ধের পশ্চাতে একজন মুসলমান দোকানদার দাঁড়াইয়াছিল, সে বৃদ্ধকে কহিল, ‘হজুর, তখনই কহিয়াছিলাম যে ফিরিজির সহিত হাঙ্গামা বাধিবার পূর্বে সপ্তগ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়া যাইবেন, আপনি নূতন সপ্তগ্রামে আসিয়াছিলেন, এদেশের হাল চাল অবগত নহেন।’ বৃদ্ধ কহিলেন, “ভাই শাহান্‌শাহ্ নূরুদ্দীন মহম্মদ জহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বে এমন হইতে পারে তাহা জানিতাম না।” “ফৌজদার কলিমুল্লা খাঁ আকিমুচী, সুবাদার মোকরম্ খাঁ বহদুরে জহাঙ্গীর নগরে, বাদশাহ আরও দূরে আগরায় অথবা দিল্লীতে, সরকার সপ্তগ্রাম, নামে মাত্র মোগল বাদশাহের ফৌজদারী, ইহা প্রকৃত পক্ষে ফিরিজি হারুমাদের রাজত্ব।”

“বন্ধু, আমরা যুদ্ধব্যবসায়ী, আমার পুত্র গোলন্দাজ, তাহার মুখে শুনিয়াছি আসদুখাঁ থাকিতে বাদশাহের প্রজার কোন ভয়ের কারণ নাই।” “আসদুখাঁ বীর বটে, কিন্তু কলিমুল্লা খাঁ কাপুরুষ, তাহার কর্মচারিগণ খুসুখোর।” “ভাই, মাহুঘে পড়িয়া শিখে আর ঠেকিয়া শিখে। দায়ে পড়িয়া সপ্তগ্রামে আসিয়া যাহা শিখিয়া গেলাম তাহা জীবনে ভুলিব না, আর যদি কখনও এ জীর্ণদেহ লইয়া বাদশাহী তথৎ গাহের সম্মুখে

পৌছিতে পারি তাহা হইলে সুবা বাঙ্গালা ফিরিঙ্গি দস্যুর অত্যাচার হইতে মুক্ত করিব।”

বৃদ্ধের কথা শেষ হইবার পূর্বে একজন পর্তুগীজ সেনানায়ক অশ্বপৃষ্ঠে আসিয়া একজন ফিরিঙ্গি সেনাকে জিজ্ঞাসা করিল, “তোমাদের নায়ক কোথায়?” ফিরিঙ্গি সিপাহী ছুটিয়া গিয়া নায়ককে ডাকিয়া আনিল। সেনানায়ক তাহাকে কহিল, “সমস্ত বন্দী মুক্ত কর।” নায়ক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কেন? পাদ্রী আলভারেজ সমস্ত পৌত্তলিক ধরিয়া লইয়া যাইতে বলিয়াছিলেন।” “পাদ্রী-দিগের জন্য পর্তুগীজ রাজত্ব মজিতে বসিয়াছে; আমিরাল ডি স্জ্জার আদেশ, বন্দীদিগকে মুক্ত কর। সম্মুখে গোকুল-বিহারী ও পশ্চাতে আসদ্‌ খাঁ আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে; গোকুলবিহারীর একজন বাঙ্গালী সেনানায়ক সমস্ত তোপ দখল করিয়াছে। যত সেনা আছে সমস্ত সম্মুখে পাঠাইয়া দাও।”

নায়কের আদেশে বন্দিগণ মুক্ত হইল, সপ্তগ্রামবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা পর্তুগীজ নৌসেনাধ্যক্ষ ডি স্জ্জাকে আশীর্বাদ করিতে করিতে যে যেদিকে পথ পাইল পলাইল। ফিরিঙ্গি সেনা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিয়া গেল; বৃদ্ধ ওমরাহ, তাঁহার পুত্রবধু, ফতেমা ও যুবতী দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা, এখন কোথায় যাইবে?” যুবতী কহিল, “নির্কটেই আমার গৃহ, সেইখানেই যাইব।”

“সেখানে তোমার কে আছে?” “কেহই নাই। সেই বৃদ্ধ ভৃত্য যদি না মরিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই আছে।”
 “চল তাহাকে দেখিয়া আসি।”

বৃদ্ধ রমণীগণকে লইয়া যুবতীর গৃহে প্রবেশ করিলেন। হবিব্ মুচ্ছিত হইয়াছিল, ফতেমা ও যুবতীর শুশ্রুষায় তাহার চেতনা ফিরিয়া আসিল। তখন বৃদ্ধ কহিলেন, “মা, অল্প রজনীতে নগর নিরাপদ নহে, চল সপ্তগ্রাম ছাড়িয়া অত্র আশ্রয় লই।” যুবতী কহিল, “ত্রিবেণীর ঘাটে আমার বজ্রা আছে।” বৃদ্ধ কহিলেন, “চল ত্রিবেণীতেই যাই।” গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সকলে পূর্বদিকে যাত্রা করিলেন।

কিয়দূর গিয়া বৃদ্ধ এক প্রশস্ত রাজপথে উপস্থিত হইলেন। পথের চারিদিকে স্তূপীকৃত মৃতদেহ পড়িয়াছিল, কামানের গোলায় চারিদিকে আগুন লাগিয়া গিয়াছিল, বৃদ্ধ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া পথ নিরূপণের চেষ্টা করিতেছিলেন। যুবতী সহসা আর্তনাদ করিয়া এক হিন্দু সৈনিকের দেহের উপরে পতিত হইল। বৃদ্ধ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা, এ তোমার কে?” যুবতী রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, “আমার খসম্।” ফতেমা বিস্মিতা হইয়া যুবতীর মুখের দিকে চাহিল, তাহা দেখিয়া যুবতী পুনরায় কহিল, “আমার খসম্ রাগ করিয়া আমায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।” বৃদ্ধ পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিল, “মা, তুমি যে বলিয়াছিলে, তোমাকে রক্ষা করিবার কেহই নাই?” যুবতী ময়ূখের উপরে মুখ দিয়া অশ্রু বদনে

মিথ্যা কহিল, সে কহিল, “আমার খসম্ যে সপ্তগ্রামে ছিলেন তাহা আমি জানিতাম না।” বৃদ্ধ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, যুবকের প্রাণবায়ু তখনও নির্গত হয় নাই। তিনি ও হবিব আহত যুবককে বহন করিয়া লইয়া জিবেণীর দিকে যাওয়া করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ঘূর্ণ বাত্যা

জহাঙ্গীর নগরের দুর্গমধ্যে নদীতীরের একটি কক্ষে বসিয়া বাঙ্গালার স্বাধার মোকরম্ খাঁ বিশ্রাম করিতেছিলেন। ভীষণ গ্রীষ্ম, একজন বাদী নবাবের পদসেবা করিতেছিল, দুই জন ময়ূরপুচ্ছ লইয়া ব্যঞ্জন করিতেছিল, এবং চতুর্থা স্থনীতল পানীয় লইয়া কক্ষের কোণে দাঁড়াইয়াছিল। এই সময়ে একজন খোজা কক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া নবাবকে অভিবাদন করিল। নবাবের নিম্নাকর্ষণ হইতেছিল, তিনি বিরক্ত হইয়া আলস্য-বিজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি চাহ?” খোজা পুনর্বার অভিবাদন করিয়া কহিল, “বন্দানওয়াজ, দেওয়ান হরেকিষণ সদরে অপেক্ষা করিতেছেন।” “হরেকিষণ অসময়ে কেন আসিল?” “বন্দা তাহাকে জানাইয়াছিল, যে স্বাধার

এখন খোয়াবগাহে, কিন্তু দেওয়ান সাহেব বলিলেন, যে বাদশাহের দরবার হইতে জরুরী পাঞ্জা লইয়া একজন সওয়ার আসিয়াছে।”

নবাব বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “হরেকৃষ্ণকে গোসল-খানায় অপেক্ষা করিতে বল, আমি আসিতেছি।” খোজা পুনরায় অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল।

মদরখালিসার দেওয়ান হরেকৃষ্ণ রায়, বঙ্গজ কায়স্থ, খৰ্ব্বাকৃতি, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। তিনি বুদ্ধিবলে সামান্য অবস্থা হইতে উন্নত হইয়া এই উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন। তখন সামান্য-বংশজাত হিন্দুর পক্ষে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর রাজপদ লাভ করা প্রায় সম্ভব হইত না। বাদশাহের সওয়ার তখনও দেওয়ান-খানায় অপেক্ষা করিতেছিল, সেই জন্ত হরেকৃষ্ণ অধীর হইয়া ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতেছিলেন। বাদশাহের পত্র অথবা ফরমান স্বয়ং স্ববাদের ব্যতীত আর কেহ গ্রহণ করিতে পারিত না। হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে মনুষ্যের ছায়া পড়িল, দেওয়ান ভীত হইয়া দুইপদ পিছু হটিয়া গেলেন। তখন দেওয়ানখানার একটি স্তম্ভের অন্তরাল হইতে গুরুগম্ভীর স্বরে উচ্চারিত হইল, “হরেকৃষ্ণ, ভয় নাই।” দেওয়ান চাহিয়া দেখিলেন যে গৈরিক-বসন-পারিহিত একজন দীর্ঘাকার সন্ন্যাসী স্তম্ভের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। হরেকৃষ্ণ ব্যস্ত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রভু, সমস্ত কুশল ত?” “কুশল জিজ্ঞাসা পরে করিও, আমি বিশেষ প্রয়োজনে ঢাকায় আসিয়াছি, তুমি

আমাকে স্ববাদারের সহিত পরিচিত করিয়া দাও।” “কি পরিচয় দিব? আপনার প্রকৃত পরিচয়?” “না, বলিও যে আমি তোমার গুরু।” “আপনি যে আম'র গুরু সে কথা ত মিথ্যা নহে, স্বমার ও খাজানার কার্য—” “ও সকল কথা থাক। আমার এক বন্ধুর কন্যাকে ফিরিজি হারমাদ্ হুগলীতে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, তুমি স্ববাদারকে অনুরোধ করিয়া তাহার মুক্তির ব্যবস্থা করিয়া দাও।” “প্রভু, বড়ই কঠিন কার্য।” “তাহা আমি জানি।” “ফিরিজিগণ স্ববাদারের বড়ই প্রিয় পাত্র।” “তাহাও আমি অবগত আছি।” “তবে কি উপায় করিব প্রভু?” “নবাবকে বল যে আমার অনুরোধ রক্ষা না করিলে একথা এক মাসের মধ্যে বাদশাহের কানে উঠিবে।” “বলেন কি? এমন কাজ কে করিবে?” “হুজ্জাহান বেগম অথবা আসকু খাঁ।” “প্রভু, আপনার অসাধ্য কার্য নাই।” “হরেকৃষ্ণ, আমার আর একটি অনুরোধ আছে।” “কি আদেশ প্রভু?” “অত্ন নবাবের বজরায় পদার্পণ করিও না, করিলে বিপদে পড়িবে।” “যে আজ্ঞা।”

এই সময়ে ফটকে নাকারা বাজিয়া উঠিল, দেওয়ানখানার দুয়ারে দাঁড়াইয়া নকীব ফুকারিল, আশা, সোটা, মহীমরাতব লইয়া অসংখ্য হরকরা ও পাইক দেওয়ানখানায় প্রবেশ করিল; বাজালার স্ববাদার নবাব মোকরম খাঁ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেওয়ান হরেকৃষ্ণ রায় নবাবকে কুণিশ করিয়া বাদশাহী দরবারের সওয়ারকে ডাকিয়া

আনিলেন। সওয়ার অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল, নবাব তিন পদ অগ্রসর হইয়া তিনবার কুর্ণিশ করিলেন, একজন হর-করা একখানি রজতের পাত্র আনিয়া নবাবের হাতে দিল এবং কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান করিল। নবাব রজত পাত্র সহিত, বাদশাহের পত্র দেওয়ানের হাতে দিয়া কহিলেন, “হরেক্ষিণ, মুরসলা বজরাই লইয়া যাও, কিল্লার ভিতরে অত্যন্ত গ্রীষ্ম।” বজরার নাম শুনিয়া দেওয়ানের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। হরেক্ষিণ কম্পিত পদে অগ্রসর হইয়া কহিলেন, “হজুর?” নবাব বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “কি বলিতেছ?”

“আমার গুরুদেব বড় বিপদে পড়িয়া জহাঙ্গীর নগরে আসিয়াছেন; জনাবালীর হুকুম পাইলে তাঁহাকে হজরতের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারি।”

“তোমার গুরু কি চায়?” “তিনি হজরতের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নিজে আরজ পেশ করিবেন।” “সে কোথায়?” “এই খানেই আছেন।” “লইয়া আইস।”

তখন সন্ন্যাসী স্তম্ভের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া কহিলেন, “ভগবান্ নবাবের মঙ্গল করুন।” নবাব দেওয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হরেক্ষিণ, তোমার মুরশিদ কি ফকীর?” হরেক্ষিণ সেলাম করিয়া কহিলেন, “হজুর।” “দেওয়ানা ফকীরের স্ববাদারের নিকট কি প্রার্থনা থাকিতে পারে?”

সন্ন্যাসী অগ্রসর হইয়া কহিলেন, “আমার প্রার্থনা আপনার জন্ত।” নবাব বিস্মিত হইয়া কহিলেন, “আমার জন্ত? কাকের,

তুমি কি পাগল হইয়াছ ?” “পাগল না হইলে সংসার ত্যাগ করিতে পারা যায় না। আমার প্রার্থনা সত্য সত্যই আপনার জন্ত।” হরেকৃষ্ণ কহিলেন, “হজুর, ইনি ত্রিকালদর্শী সাধু পুরুষ; ইনি যাহা বলিতে আসিয়াছেন মেহেরবাণী করিয়া তাহা শুনুন।” নবাব বলিলেন, “ফকীর কি বলিতে আসিয়াছ বল।” “আপনি অল্প নৌকায় উঠিবেন না।” “কেন ? আমি এখনই বজ্রায় যাইতেছি।” “অল্প নৌষানে ভ্রমণ করিলে আপনার বিপদ হইবে।” “ফকীর সত্য সত্যই পাগল। তুমি কি এই কথা বলিবার জন্ত জহাঙ্গীর নগরে আসিয়াছ ?” “আমার আরও একটি অনুরোধ আছে, আমার এক বন্ধুর কন্যাকে মখস্‌সাবাদ হইতে ফিরিঙ্গিরা সপ্তগ্রামে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। বাদশাহ ঈশ্বরের ছায়া, আপনি তাঁহার প্রতিনিধি, আপনার অনুরোধ ব্যতীত অসহায়া বালিকার উদ্ধার অসম্ভব।” “ফকীর, ফিরিঙ্গি লড়াইতে বড়ই বাহাদুর; তাহারা শাহানুশাহ্ বাদশাহের হুকুম সকল সময়ে তামিল করে না, তাহারা কি আমার অনুরোধ গ্রাহ্য করিবে ?” “নিশ্চয়ই করিবে।”

হরে। ১০ জনাবালী হিন্দুস্থানের রুস্তম, বাদশাহী দরবারের আফ্‌তাব ও মাহ্ ; সুবা বাঙ্গালায় এমন কে বেবুফ্ আছে যে হজুরের ফরমান্ বরদারী করিবে না ? জনাবালীর মুখ হইতে আওয়াজ বাহির হইতে হইতে সপ্তগ্রাম ও চট্টগ্রামের সমস্ত ফিরিঙ্গি তাহা তামিল করিবে।

নবাব। হরেকিষণ, তোমার খাতিরে ফকীরের

দরখাস্ত মঞ্জুর করিলাম, কিন্তু সেই বালিকাকে ফিরিজি-
দিগের নিকট হইতে খরিদ করিয়া আনিতে হইবে।

সন্ন্যাসী। তাহার। যদি বিক্রয় না করে ?

নবাব। তখন কলিমুল্লা খাঁকে হুকুম দিব, সে
তোমার আত্মীয়াকে ছিনাইয়া লইয়া আসিবে।

সন্ন্যাসী। অর্থলোভে অথবা নবাবের খাতিরে,
পর্তুগীজ সেনাপতি বালিকা ছাড়িতে চাহিলে পাদ্রীরা
তাহাকে ছাড়িবে না।

নবাব। তুমি কি সেই বালিকাকে খরিদ করিবার
চেষ্টা করিয়াছিলে ?

সন্ন্যাসী। ইহার জ্ঞান করি নাই বটে, কিন্তু পূর্বে
দুই এক বার করিয়াছি, তখন এই জবাব পাওয়াছিলাম।

নবাব। ফকীর, আমার অনুরোধ আর একবার
চেষ্টা করিয়া দেখ।

নবাব এই বলিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিলেন, তাহা
দেখিয়া হরেকৃষ্ণ অতি বিনীত ভাবে কহিলেন, “হুজুর, বন্দার
শরীর অসুস্থ, জনাবালীর হুকুম পাইলে, নায়েব দেওয়ানকে
পাঠাইয়া দি।” “হরেকৃষ্ণ, তুমি কাফেরের কথা শুনিয়া ভয়
পাইয়াছ ?” “না ; আমার শরীর তিন দিন যাবৎ অসুস্থ
আছে।” “তবে মহম্মদ আমিন খাঁকেই পাঠাইয়া দাও।”
হরেকৃষ্ণ অব্যাহতি পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

নবাব অম্বর মহলে প্রবেশ করিলে সন্ন্যাসী হরেকৃষ্ণকে

কহিলেন, “হুত্ব স্বয়ং আসিয়াছেন, মোকরম খাঁ সামান্য মানুষ, সে কি করিবে?” হরেকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন?” “মোকরম খাঁ মরিতে চলিয়াছে।” “কেমন করিয়া?” “বাহিরে আসিয়া দেখ।”

উভয়ে দেওয়ানখানা পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দূরে বুড়ী গঙ্গার প্রশস্ত বক্ষে স্রবানারের প্রকাণ্ড বজরা নঙ্গর করা ছিল; এই সময়ে তাহা আসিয়া কিল্লার ঘাটে লাগিল। ক্ষণকাল পরে স্রবানার ও অন্যান্য বিশিষ্ট রাজ-কর্মচারিগণ বজরায় উঠিলেন। বজরা ছাড়িল, তাহা দেখিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন, “হরেকৃষ্ণ, মোকরম খাঁ ত চলিল; আসদ্ খাঁ কোথায়?” হরেকৃষ্ণ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন প্রভু?” “এইবার আসদ্ খাঁ স্রবানারি লাভ করিবে।”

সহসা নদীবক্ষে বিস্তৃত বালুক্ষেত্র বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে শান্ত নদীবক্ষ ভীষণ মূর্তি ধারণ করিল; চারিদিক্ হইতে মেঘ আসিয়া নীলাকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; বেগে বায়ু বহিতে আরম্ভ করিল, স্রবানারের বজরা ভীষণ বেগে নাচিতে আরম্ভ করিল, কিল্লা হইতে হাহাকার রব উঠিল। বৃষ্টি আরম্ভ হইল, পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গমালা আসিয়া কিল্লায় আছাড়িয়া পড়িতে লাগিল, সহসা প্রকাণ্ড বজরা অদৃশ্য হইল। সন্ন্যাসী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, “হরেকৃষ্ণ, দেখিলে?” দেওয়ান বিষন্ন বদনে কহিলেন, “দেখিলাম, প্রভু, এখন আমার কি উপায় হইবে?” “তোমার কোন ভয় নাই, তুমি দেওয়ানই

থাকিবে।” “প্রভু, ভবিষ্যৎ যখন আপনার অবিদিত নহে, তখন আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিলেন না কেন?” “হরেকৃষ্ণ, বিধিলিপি অখণ্ডনীয়। আসদ্ খাঁ কোথায়?” “বোধ হয় সপ্তগ্রামে।” “আমি চলিলাম, তাহার সহিত ফিরিব।” সন্ন্যাসী এই বলিয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

চৈতন্যদাস বাবাজী

মসীকৃষ্ণবর্ণ, খর্বাকার, লম্বোদর, মুণ্ডিতশীর্ষ, একজন বৈরাগী সরস্বতী ও গঙ্গা সঙ্গমের নিকটে, সেই তিস্তিড়ি বৃক্ষের নিম্নে বসিয়া ঘনঘন নশ্ত লইতেছিল। তাহার পার্শ্বে কৃশকায়, কৃষ্ণবর্ণ একটি দীর্ঘাকার যুবক দাঁড়াইয়াছিল। ঘাটে যে কয়খানি নৌকা আসিল, বৈরাগী তাহাদের প্রত্যেক খানির মাঝি মাঝাদিগকে হুগলী যাইতে অহুরোধ করিল; কিন্তু কেহই সম্মত হইল না। ঘাটে যে কয়খানি নৌকা ছিল তাহাদিগের মাঝিরা কহিল, “বাবাজী, আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, আজ সপ্তগ্রামের কোন নৌকা হুগলীর দিকে যাইতে সাহস করিবে না।” বৈরাগী কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কেন বাপু? আমার যে হুগলীতে বিশেষ প্রয়োজন আছে।” একজন বৃদ্ধ ধীবর

কহিল, “বাবাজী, আট আনা পয়সার জুতা কে মরিতে যাইবে ? কাল রাত্রিতে সাতগাঁয়ে ফিরিঙ্গির সহিত ফৌজদারী সিপাহীর ভীষণ-হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে, ফিরিঙ্গিরা হটিয়া পলাইয়া গিয়াছে, তাহাতে তাহাদের রাগ আরও বাড়িয়া গিয়াছে, এখন সাতগাঁয়ের লোক পাইলে তাহারা শূলে দিবে।” তাহার কথা শুনিয়া বৈরাগী আর কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইল না, শম্বুকের পটহ হইতে ঘন ঘন নশ্র লইতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে জনৈক দীর্ঘাকার শ্যামবর্ণ ব্রাহ্মণ তিস্তিড়িতলে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে ইতস্ততঃ চাহিতে দেখিয়া বৈরাগীর মনে ভরসা হইল, সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল, “ঠাকুর মহাশয়, প্রণাম হই, আপনি কি কোন স্থানে যাইবেন ?” ব্রাহ্মণ বিরক্ত হইয়া বৈরাগীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল এবং ক্ষণকাল পরে কহিল, “বাপু হে, কোথায় যাইব তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। তুমিও কি কোথাও যাইবে না কি ?” “আজ্ঞা, সে প্রভুর ইচ্ছা, ছগলী যাইবার মানস ছিল, কিন্তু নৌকা পাওয়া যায় না। রাধে কৃষ্ণ, রাধে কৃষ্ণ, ঠাকুর মহাশয় কি সাতগাঁয়ে নূতন আসিয়াছেন ?” “কেন বল দেখি ?” “এই চাল চলন দেখিয়া বলিতেছি। সহরের লোকের চাল চলন আলাহিদা রকমের, আমিও পল্লীগ্রামের লোক।” “বটে, তোমার নিবাস কোথায় ?” “কাটোয়ার নিকটে উদ্ধারণপুরে, ঠাকুর মহাশয়।” “আপনার ?” “মুখস্থলবাদের নিকটে ভীমেশ্বরে।”

বৈরাগী বড় নিরল্জ্জ ; ব্রাহ্মণ কোথায় যাইবে তাহা জানি-
বার ইচ্ছা সে কোন মতেই দমন করিতে পারিতেছিল না ।
বৈরাগী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, “বলি ঠাকুর মহাশয় কি
সাতগাঁয়ে যাইবেন ?”

সেই সময়ে পথ দিয়া একজন মাতাল টলিতে টলিতে
যাইতেছিল, সে বৈরাগীর কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিল, “বাবাজী,
এমন কাজ করিও না, তোমার মত নধরু পাঁঠা পাইলে
ফিরিঙ্গিরা লোভ সম্বরণ করিতে পারিবে না, গির্জায় লইয়া
গিয়া বলি দিবে ।” বৈরাগী বলিল কথা শুনিয়া নিষ্ঠীবন ত্যাগ
করিয়া কহিল, “রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ । ঠাকুর মহাশয়,
বেটা বড়ই বেঙ্গিক ।” মাতাল সেইখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া
টলিতে লাগিল এবং কহিল, “মিথ্যা নহে বাবাজী, তোমার
ভুঁড়ীটিতে অনেক মাংস আছে, সুন্দর শিখ কাবাব্ বনিবে ।”
বৈরাগী আবার নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিল, ব্রাহ্মণ জ্রুক হইয়া রোষ-
কষায়িত নেত্রে মদ্যপের দিকে চাহিল । সে লজ্জিত না হইয়া
কহিল, “ঠাকুর চটেন কেন ? কাবাব্ অতি সুন্দর দ্রব্য ।”
ব্রাহ্মণ কহিলেন, “সুন্দর দ্রব্য হয় তুমি গিয়া খাও ।” “ঠাকুর,
এমন পাঁঠাটি ছাড়িয়া যাইব ?” “তুমি বড় জ্বালাতন আরম্ভ
করিলে, শীঘ্র এ স্থান পরিত্যাগ কর ।” বৈরাগী বলিল,
“ঠাকুর, চলুন সরিয়া যাই, সাত গাঁ অতি কুস্থান, বেটা হয় ভ
এখনই বমন করিয়া দিবে ।”

বৈরাগীর কথা শুনিয়া মদ্যপ ক্রোধে অধীর হইয়া বৈরাগীর

দীর্ঘ শিখা ধারণ করিয়া কহিল, “তবে রে বেটা নেড়া, তুই আমাকে বেটা বলিস্? তোর এত বড়া স্পর্দ্ধা হইয়াছে? চল্ আমি তোকে সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে লইয়া গিয়া বলি দিব।” বৈরাগী যাতনায় অস্থির হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল; কিন্তু তথাপি সিদ্ধেশ্বরী ও বলি শুনিয়া নিষ্টিবন পরিত্যাগ করিতে তুলিল না। বৈষ্ণবের শিখা ছিঁড়িয়া যায় দেখিয়া সকলে মিলিয়া তাহাকে মত্তপের হাত হইতে বাঁচাইল। মাতালু টলিতে টলিতে চলিয়া গেল। তখন বৈরাগী মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল, “ঠাকুর মহাশয়, সত্য না কি?” ব্রাহ্মণ কহিলেন “কি?” “ঐ বেটা যাহা বলিল?” “আবার গালি দিতেছ? এখনই ত মরিতে বসিয়াছিলে?” “এখন ত আর শুনিতে পাইবে না?” “না পাউক, বৃথা গালি দিয়া ফল কি?” “ভাল, দিব না। ঠাকুর মহাশয়, কথাটি কি সত্য?” “কি কথা?” “ঐ যা বলিল?” “সেত অনেক কথাই বলিল, তুমি কোন্ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ?” “ঐ যে, গির্জায় গিয়া—” “গির্জায় গিয়া কি?” “ঠাকুর, সে কথা কি মুখে আনিতে আছে? খুঃ।” “তবে আমি বুঝিব কেমন করিয়া?” “ঐ যে গির্জায় গিয়া, আপনাদের সেই কাল মাগীর সম্মুখে যাহা করেন তাহাই?” “ও, বলির কথা বলিতেছ?”

বৈরাগী পুনরায় নিষ্টিবন ত্যাগ করিল। ব্রাহ্মণ এই-বার বড়ই চটিল এবং কহিল, “পাষণ্ড, তুই মহামায়ার

নামে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতেছি? তোর নরকেও স্থান হইবে না।”

বৈরাগী বড়ই বিপদে পড়িল, সপ্তগ্রামে গমন তাহার নিতান্ত আবশ্যক, অথচ গির্জায় নরবলির কথা শুনিয়া সে বড়ই ভীত হইয়াছিল ; তাহার আর একাকী সপ্তগ্রামে যাইবার ভরসা হইতেছিল না। ব্রাহ্মণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া বৈরাগী করষোড়ে কহিল, “ঠাকুর মহাশয়, অপরাধ লইবেন না।” ব্রাহ্মণ মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল ; তখন বৈরাগী পুনরায় কহিল, “ঠাকুর মহাশয়, আমি কি করিব ? গুরুর আদেশ।” “তোমার গুরু কি তোমাকে মহামায়ার নামে থুতু ফেলিতে বলিয়াছে ?” “না, না। লোকাচার।” “এমন লোকাচার সকলে সহিবে কেন ?” “ঠাকুর মহাশয়, অপরাধ হইয়াছে।”

ব্রাহ্মণের ক্রোধ অধিকক্ষণ থাকে না। ব্রাহ্মণ প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, “বাবাজী, তুমি কি পাগল হইয়াছ, ঐষ্টানে কখন নরবলি দেয় ?” বলি শুনিয়া বৈরাগী থুতু ফেলিতে যাইতেছিল, বহু কষ্টে আত্মসম্বরণ করিল। এই সময়ে সাত আটজন লাঠিয়াল আসিয়া ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিল। তাহাদিগের মধ্যে একজন বৃদ্ধ কহিল, “ঠাকুর মহাশয়, কোন সংবাদই পাইলাম না। সারা সহর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছি, যত লোক মরিয়াছে অথবা জখম হইয়াছে তাহাদিগের সকলকেই দেখিয়া আসিয়াছি। মহারাজকে ত কোথাও দেখিলাম না।” ব্রাহ্মণ সংবাদ শ্রবণে চিন্তিত হইয়া কহিলেন, “তাই ত ভুবন, আমি

নবম পরিচ্ছেদ

ভাবিয়াছিলাম এইবার সন্ধান পাইব। নৌকা কোথায় আছে ?” “নিকটেই বাদশাহী পুলের নীচে।” “তোমাদের আহার হইয়াছে ?”

তখন দিবা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে, ব্রাহ্মণের তখনও স্নানাহার হয় নাই। ভুবন তাঁহার মুখ দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারিল এবং কহিল, “খাইব কি ঠাকুর মহাশয় ? সকাল হইতে ত ঘুরিয়াই বেড়াইতেছি। চলুন নৌকায় ফিরিয়া যাই।”

বৈরাগী নৌকার কথা শুনিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, “ঠাকুর মহাশয়ের কি নৌকা আছে ? তাহা হইলে ত ভ্রগলীতে যাইতে পারা যায় ?” ব্রাহ্মণ হাসিয়া কহিলেন, “যায় বই কি, বাবাজী, তুমি আমাদিগের সহিত আইস, আমরা অপরাহ্নে ভ্রগলী যাইব।” বাবাজী সানন্দে কহিল, “গৌরহরি, গৌরহরি ; ঠাকুর মহাশয়, ভ্রগলীতে আমার শিষ্যবাড়ী পায়ের ধূলা দিতে হইবে।” ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার শিষ্য কি জাতি ?” “আজ্ঞা, তন্ত্রবায়।” “বাবাজী, তোমার মঙ্গল হউক, আমি শূদ্রের গৃহে অন্ন গ্রহণ করিব কি প্রকারে ?” “ফলাহার করিবেন ; উত্তম চিড়া, ঘন ক্ষীর, বাথানের দধি, মর্ত্তমান রস্মা এবং গোল্লা।”

বৈরাগীর স্বকণী বহিয়া লাল গড়াইয়া পড়িল ; ব্রাহ্মণ তাহা দেখিয়া আর হাস্ত সম্বরণ করিতে পারিলেন না, তিনি মন খুলিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বৈরাগীর শিষ্য পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল, সে ঘন ঘন স্বকণী লেহন করিতেছে দেখিয়া,

ব্রাহ্মণ কহিলেন, “আমরা শূদ্রগৃহে ফলাহারও করি না। বাবাজী, তোমাদিগের বোধ হয় আহার হয় নাই?” “আজ্ঞা না।” “ভাল, অতঃ তোমরা আমার অতিথি।” “ঠাকুর মহাশয়ের অন্ন প্রসাদ পাইব না ফলাহার করিব?” “এবেলা অন্ন প্রসাদ পাইবে ওবেলায় ফলাহার করিও। ভুবন, মহারাজ হয় ত ফিরিজির হাতে বন্দী হইয়াছেন, আমরা আহা-রাশ্বে নৌকা লইয়া হুগলী যাইব, তুমি নৌকায় পাকের উদ্যোগ কর।” “যে আজ্ঞা।”

সকলে ভুবনের নৌকায় আরোহণ করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

সেই দিন অপরাহ্নে ত্রিবেণীতে মুকুন্দদেবের ঘাটের অনতিদূরে একখানি বৃহৎ বজরা হইতে মধুর সঙ্গীতধ্বনি উত্থিত হইতেছিল; মধ্যে মধ্যে সঙ্গীতের পরিবর্তে সেতারের মিঠা আওয়াজ শুনা যাইতেছিল। তীরে গীত বাজ শুনিবার জন্ত লোক জমিয়া গিয়াছিল। বজ্রার মধ্যে একটি প্রশস্ত কঙ্কে গালিচার উপরে বসিয়া একটি যুবতী সেতার বাজাইতেছিল, তাহার পার্শ্বে বসিয়া আর একটি যুবতী সঙ্গীত করিতেছিল, কঙ্কের প্রান্তে একখানি ক্ষুদ্র হস্তিদন্তের খট্টায় একজন গৌর-বর্ণ যুবক শয়ন করিয়াছিল। যুবক চেতনাহীন, তাহার সর্বদে-

ক্ষত চিহ্ন। ক্ষত স্থান সমূহ বহু বস্ত্র খণ্ডে আবদ্ধ, তাহা স্থানে স্থানে রক্তাক্ত। কিয়ৎক্ষণ পরে যুবক অশ্রুট স্বরে কি কহিল। তাহা শুনিয়া যুবতী সেতার রাখিল এবং শয্যাপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল।

যুবক চক্ষুরুন্মীলন করিল এবং যুবতীকে দেখিয়া কহিল, “কে? ললিতা? কখন আসিলে?” যুবতী শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিয়া উভয় করে যুবকের দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, “কি বলিতেছ? আমাকে কি চিনিতে পারিতেছ না?” যুবকের অধরে হাশ্বের ক্ষীণরেখা দেখা দিল, যুবক কহিল, “কেন পারিব না?”

“বল দেখি আমি কে?” “তুমি ললিতা।” “ললিতা কে? আমি যে গুলরুখ।” “মিথ্যা কথা, তুমি ললিতা, এ ভীমেশ্বর। ললিতা, তুমি কখন আসিলে? আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।”

“তুমি কি বলিতেছ? এ যে সপ্তগ্রাম, সরস্বতী গঙ্গার মোহানায় আমাদের বজ্রা লাগিয়াছে। আমি গুলরুখ, তুমি কি এখনও আমাকে চিনিতে পার নাই?” “চিনিয়াছি। ললিতা, তুমি বুঝি একটা নূতন মুসলমানী নাম শিখিয়াছ?” “অধিক কথা কহিও না। তোমার এখনও জ্ঞান হয় নাই।” “ললিতে, এ আবার কি ছলনা? সন্ধ্যাবেলায় গোপালের মন্দিরে আরতি দেখিতে যাইব বলিয়াছিলাম, চল যাই।”

যুবক শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল, তাহা

দেখিয়া যুবতী তাহাকে বলপূর্বক চাপিয়া ধরিল এবং কহিল, “উঠিওনা, উঠিওনা, এখনই ক্ষতমুখে রক্তস্রাব আরম্ভ হইবে।” যুবক মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, “বড় বেদনা, উঠিতে পারিলাম না, আমার কি হইয়াছিল ললিতা?” “ললিতা কে?” “তুমি কি ললিতা নহ?” “আমি যে গুলকণ্ঠ; জীবনসৰ্বস্ব, তুমি আমায় চিনিতে পারিতেছ না কেন?” “চিনিতে পারিব না কেন, তুমি নিশ্চয় ললিতা।” “তবে আমি ললিতা।” “এতক্ষণ দুষ্টামি করিতেছিলে কেন? ললিতা, আমার সৰ্ব্বাঙ্গে বেদনা কেন?” “তুমি যে যুদ্ধে আহত হইয়াছ।” “যুদ্ধ? কোথায় যুদ্ধ?” “কেন সপ্তগ্রামের যুদ্ধ?” “সপ্তগ্রাম? আমি কি ভীমেশ্বরে নাই? তবে কি স্বপ্ন সত্য?”

এই সময়ে কক্ষের দ্বারের পরদা অপসারিত হইল, পূর্ব রাত্রির বৃদ্ধ দ্বারে দাঁড়াইয়া কহিলেন, “মা, হকিম আসিয়াছেন।”

যুবতী শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ করিয়া কহিল, “হকিমকে লইয়া আসুন, আমি কক্ষেই থাকিব।” বৃদ্ধ হকিমকে লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন, হকিম রোগীকে পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, “আঘাত গুরুতর, তবে যুবা বয়স, সম্ভবতঃ আরোগ্য হইবেন। ইনি কোথায় আহত হইলেন?” বৃদ্ধ কহিলেন, “কল্যা রাত্রির যুদ্ধে।” “ইনি কি বাদশাহী ফৌজের সেনা?” “হাঁ।” “শুনিয়াছি গোকুলবিহারীর একজন নায়ক বড় ভারি লড়াই করিয়াছে। আসদ্ খাঁ বলিতেছিলেন যে তাহার জন্যই সপ্তগ্রাম রক্ষা হই-

যাচ্ছে।” “সে কি কাফের না মুসলমান?” “সে যুধা কাফের ; হতভাগ্য হয় নিহত হইয়াছে, না হয় বন্দী হইয়াছে।” “ফিরিঙ্গির হস্তে বন্দী হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়ঃ।” “খোদা মালিক ছুরউদ্দীন জহাঙ্গীর বাদশাহের রাজ্যে এ অত্যাচার অসহ্য। একটা প্রলেপ পাঠাইয়া দিব তাহা ক্ষতস্থানে লেপন করিবেন ; দুই প্রকার ঔষধ আসিবে, তাহা প্রতি গ্রহণে সেব্য।” “রোগী বড়ই অস্থির, চাঞ্চল্য বাড়িলে ক্ষতস্থান হইতে রক্তস্রাব হয়।” একটা জাফ্রাণ বর্ণের চূর্ণ পাঠাইয়া দিব, অস্থির হইলে তাহা সরবতের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইয়া দিবেন।”

হকিম প্রস্থান করিলেন। বৃদ্ধ ফিরিয়া আসিয়া যুবতীর হস্তে একটা কোঁটা দিয়া কহিলেন, “মা, তোমার স্বামী অস্থির হইলে এই ঔষধের একমাত্রা সরবতের সহিত মিশাইয়া সেবন করাইও।” বৃদ্ধ কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। যুবক এতক্ষণ নীরব ছিল, এইবার সে যুবতীকে ডাকিয়া কহিল, “ললিতা বৈত দাড়ি রাখিল কবে? ব্রজনাথ সেন ত বৈষ্ণব, সে ত গোঁফ, দাড়ি, চুল সমস্তই কামাইয়া ফেলিত?” “বৈত হইবে কেন? ইনি সপ্তগ্রামের প্রসিদ্ধ হাকিম, আশ্রফ, আলী খাঁ।” যুবক হাসিল, কহিল, “তুমি কি সপ্তগ্রামের স্বপ্ন দেখিতেছ?”

“স্বপ্ন কেন? এ ত সত্য সত্যই সপ্তগ্রাম?” যুবক বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিল, “হয় তুমি পাগল হইয়াছ ললিতা,

নয় আমি পাগল হইয়াছি। এ সপ্তগ্রাম নহে ভীমেশ্বর, তুমি ললিতা আমি ময়ূখ। সন্ধ্যা হইয়াছে, চল তোমাকে গৃহে লইয়া যাই, রাধিকা দিদি কোথায় গেল?”

যুবক পুনরায় শয্যা ত্যাগ করিবার উপক্রম করিল, যুবতী তাহাকে বাহু পাশে আবদ্ধ করিয়া বহু কষ্টে নিবারণ করিল। তখন ফতেমা হকিমপ্রদত্ত ঔষধ সরবতের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইয়া আসিল, যুবতীর হস্ত হইতে যুবক তাহা পান করিল ও তৎক্ষণাৎ নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

যুবতী ধীরে ধীরে শয্যাপার্শ্ব হইতে উঠিয়া পার্শ্বের কক্ষে প্রবেশ করিল, সেই স্থানে এক বৃদ্ধ দুগ্ধফেননিভ শয্যার উপরে বসিয়া পত্র লিখিতেছিলেন, তিনি যুবতীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “কি হইয়াছে মা?” যুবতী কহিল, “কিছু নয়। আপনি কাহাকে পত্র লিখিতেছেন?” “আসদ্ খাঁকে। পুত্রকে লইয়া দিল্লী যাইব, ফৌজদার কলিমুল্লা খাঁ পলায়ন করিয়াছে। আসদ্ খাঁর অহুমতি লইয়া পুত্রের সহিত দিল্লীতে ফিরিব, সেইজন্য অত্ন রাত্রিতে তাঁহাকে বজরায় আসিতে লিখিলাম।”

বৃদ্ধের কথা শুনিয়া যুবতী প্রমাদ গণিল; সে ভাবিল যে যুবক যখন সৈনিক তখন সে নিশ্চয়ই আসদ্ খাঁর পরিচিত। আসদ্ খাঁ আসিলে বৃদ্ধের নিকট সমস্তই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। গুলরুখ্ ব্যস্ত হইয়া কহিল, “পিতা, অত্ন আসদ্ খাঁকে পত্র লিখিয়া কাজ নাই, উনি মুক্ত বায়ুর জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়া-

ছিলেন, চলুন, বজ্রায় অল্পদূরে ভ্রমণ করিয়া আসি।”
“চল।”

মাল্লারা বজরা ছাড়িয়া দিল, বজরা দক্ষিণদিকে চলিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, ঘন কুজাটিকায় গঙ্গাবক্ষ আচ্ছন্ন। গঙ্গাবক্ষ শূন্য, ফিরিঙ্গির ভয়ে একখানিও নৌকা সপ্তগ্রাম ত্যাগ করে নাই। সহসা বজরার পশ্চাতে বহু তরুণের শব্দ শ্রুত হইল। বজরার মাঝি বৃদ্ধকে জানাইল যে পশ্চাতে একখানি বড় নৌকা দ্রুতবেগে আসিতেছে। বজরার মুখ ফিরিল, দেখিতে দেখিতে একখানি বৃহৎ নৌকা আসিয়া পড়িল। নৌকাখানি ছিপ্ নহে, পশ্চিমবঙ্গে পারাপারের জন্ত ঘেরূপ বৃহৎ নৌকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে ইহা সেইরূপ একখানি নৌকা। নৌকা বজরার পার্শ্বে আসিয়া পৌঁছিলে, বৃদ্ধ দেখিলেন যে তাহাতে পঞ্চাশ ষাটজন অস্ত্রধারী পুরুষ দাঁড়-টানিতেছে, মাঝির পার্শ্বে একজন শুভ্রবসনপরিহিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দাঁড়াইয়া আছেন। বৃদ্ধ নৌকা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং বজরার মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মাঝি, এ কোথাকার নৌকা?” মাঝি পূর্ববঙ্গের অধিবাসী, সে কহিল, “হজুর, মুই কতি পারিনে, উত্তরের নাও হবে।”

এই সময়ে নৌকা আসিয়া বজরার পার্শ্বে দাঁড়াইল; সেই ব্রাহ্মণ বৃদ্ধকে কহিলেন, “মহাশয়, আপনি বজরা লইয়া কোথায় যাইতেছেন?” বৃদ্ধ কহিলেন, “আমি সপ্তগ্রাম হইতে জলপথে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছি, সপ্তগ্রামে ফিরিয়া যাইব।”

“তবে শীঘ্র ফিরিয়া যাউন, আমিও সপ্তগ্রাম হইতে আসিতেছি। বন্দরে শুনিলাম যে, সন্ধ্যার পরে ফিরিঙ্গিদের সমস্ত ছিপ্ নৌকা লুণ্ঠিতে বাহির হইবে।”

“কাফের, তোমরা কোথায় ঘাইতেছ?” “হুগলীর বন্দরে।” “ফিরিঙ্গিরা কি তোমাদের ছাড়িয়া দিবে?” “আমরা ইচ্ছা করিয়া ফিরিঙ্গির হাতে ধন দিতে ঘাইতেছি।” নৌকা ছাড়িয়া দিল। বজ্রা সপ্তগ্রামের দিকে ফিরিল; তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, কিন্তু গঙ্গাতীরে কোন গ্রামে দীপ জলে নাই। গঙ্গাবক্ষ শূন্য, নিস্তব্ধ, কুয়াসায় আচ্ছন্ন। তখন সমুদ্রের জলরাশি জোয়ারের বেগে নদীতে প্রবেশ করিয়া আবার ফিরিয়া চলিয়াছে। ভীষণ শ্রোতের বিপরীতে বৃহৎ বজ্রা অতি ধীরে ধীরে চলিতেছিল। সহসা অন্ধকার ভেদ করিয়া একখানি বৃহৎ ছিপ্ বজ্রার পার্শ্বে আসিয়া লাগিল, বন্দুক হস্তে চারি পাঁচজন ফিরিঙ্গি বজ্রায় উঠিল এবং নাবিকদিগকে বাঁধিয়া ফেলিল; নৌকার সমস্ত আরোহী বন্দী হইল, বজ্রা হুগলীর দিকে চলিল।

বজ্রা হুগলীর দুর্গের সম্মুখে পৌঁছিলে, ছিপ্ হইতে একটি হাউই ছুটিল; তাহা আকাশে উঠিলে, তাহা হইতে একটি নীল একটি লাল ও একটি শ্বেত তারকা ফুটিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ দুর্গ হইতে আর একটি হাউই উঠিল, তাহা হইতেও ঐরূপ তিনটি তারা ফুটিয়া উঠিল। বজ্রা আবার চলিতে আরম্ভ করিল। দুর্গের সম্মুখে সেই উত্তরদেশীয় নৌকাখানি

দাঁড়াইয়াছিল, বজরা দেখিয়া সেই ব্রাহ্মণ নৌকার কর্ণধারকে কহিলেন, “ভুবন, এত সেই বজরা, সপ্তগ্রামে না গিয়া হুগলীতে আসিল কেন? নিশ্চয়ই ফিরিজি হান্সাদের নিকট বন্দী হইয়াছে।” ভুবন কহিল, “ঠাকুর, পথে ত ফিরিজির ছিপ্ বা কোশা দেখিতে পাইলাম না?” “হয়ত অন্ধকারে লুকাইয়া গিয়াছে। ভুবন বজরা মার।”

“সহসা ষাটজন বলিষ্ঠ ধীবর একসঙ্গে দাঁড় ফেলিল, নৌকার আরোহিণ একলক্ষে বজরার উপরে গিয়া পড়িল। ফিরিজিগণ সতর্ক ছিল না; তাহারা অনায়াসে বন্দী হইল। তখন ভুবন উচ্চৈঃস্বরে কহিল, “বজরার মুখ ফিরাইয়া দে, সপ্তগ্রামে যাইবে।” তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া বজরার অভ্যন্তর হইতে সেই আহত যুবক ডাকিল, “ভুবন?” সে স্বর শ্রবণ করিয়া ভুবনের সমস্ত দেহ কম্পিত হইল, সে আবেগক্লক্লকণ্ঠে উত্তর দিল, “মহারাজ, যাই।”

সহসা দুর্গের উপরে বিশাল অগ্নিকুণ্ড জলিয়া উঠিল, তীব্র আলোকে নদীবক্ষ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, ভীষণ শব্দে দুই তিনটি তোপ গর্জিয়া উঠিল। আলোক নিবিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে বজরা ও নৌকা গঙ্গাগর্ভে নিমগ্ন হইল। তখন চারিদিক হইতে পাঁচ সাত খানি ছিপ্ আসিয়া আরোহী ও নাবিকগণকে বন্দী করিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বিনোদিনী বৈষ্ণবী

হুগলী দুর্গের পার্শ্বে গোময়লিপ্ত একখানি ক্ষুদ্র সুন্দর কুটার ছিল, তাহাতে প্রায় বিগতযৌবনা এক বৈষ্ণবী বাস করিত। বৈষ্ণবী যৌবনে সুন্দরী ছিল, সে সৌন্দর্য্য সে এখনও বাধিয়া রাখিবার চেষ্টা করে। লোকে বলিত সে বৈষ্ণবী ব্রাহ্মণের কন্যা, ফিরিজিরা তাহাকে দূরদেশ হইতে ধরিয়া আনিয়াছিল। একজন ফিরিজি সেনানায়ক তাহার যৌবন-লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে স্বীয় অঙ্কশায়িনী করিয়াছিলেন। ফিরিজি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে, সে দুর্গের বাহিরে আসিয়া বাস করিয়াছিল। তাহার যৌবন গতপ্রায় হইলেও, হুগলীর ফিরিজি মহলে তাহার যথেষ্ট পসার ছিল; সেইজন্য হুগলীর হিন্দুজাতীয় আবালবৃদ্ধবনিতা তাহাকে যমের ন্যায় ভয় করিত। লোকে বলিত যে বিনোদিনী বৈষ্ণবী হুগলী কেল্লার বাহিরে ফিরিজি কেল্লার ফৌজদার।

প্রভাতে বৈষ্ণবী তাহার গৃহের অঙ্গনে তুলসীমঞ্চের সম্মুখে বসিয়া জপ করিতেছিল; তাহার চারিদিকে তিন চারিটি বিড়াল বসিয়াছিল; কুটারদ্বারে একটা বিলাতী কুকুর নিজগাজ্জ লেহন করিতেছিল। এমন সময়ে শিশিরস্নাত মল্লিকার ন্যায় একটি সুন্দরী যুবতী স্নান করিয়া আঙ্গুরবস্ত্রে গৃহে প্রবেশ করিল।

তাহাকে দেখিয়া বৈষ্ণবী মালা রাখিয়া কহিল, “আসিলি মা ? এত কি বিলম্ব করিতে হয় ? তোমার জন্য আমার একদণ্ডও শাস্তি নাই। মাথার কাপড়টাও টানিয়া দিস্ নাই ?” যুবতী অবগুণ্ঠনশূন্যা, কিশোরীর ন্যায় তাহার বজ্রাঞ্চল কটিদেশে আবদ্ধ ; যুবতী লজ্জাশূন্যা ; তাহার ন্যায় রূপসী ঘোড়শীর এমন লজ্জাহীনতা বঙ্গদেশে তখনও দেখা যাইত না। যুবতী হাসিয়া কহিল, “মাথায় কেন কাপড় দিব মা ?” বৈষ্ণবী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল “তোকে কি বুঝাইব মা ? তুই যে পাগল হইয়াছিস্ ভালই হইয়াছে, নহিলে এই রূপের ডালি লইয়া হাঙ্গামাদের সহরে তোমার অশেষ দুর্গতি হইত। তুই যা, কাপড় ছাড়িয়া ফুল তুলিতে যা।” যুবতী উন্মাদিনী, তাহার কলহাশ্রু ক্ষুদ্র কুটীর মুখরিত করিল ; সে জিজ্ঞাসা করিল, “কেন মা ? আমার রূপ কোথা হইতে আসিল ? আমি কেন পাগল হইলাম ?” বৈষ্ণবী পুনরায় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, “যিনি তোকে দয়া করিয়া পাগল করিয়াছেন তিনিই তোকে এই দেবদুল্লভ রূপরাশি দিয়াছিলেন। কথায় কাজ নাই, আমার জপ শেষ হইল নাই, তুই ফুল তুলিতে যা।”

যুবতী কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিল, ও মুহূর্ত্তমধ্যে একখানি গৈরিকরঞ্জিত বস্ত্র পরিয়া ফুলের সাজি লইয়া চলিয়া গেল। বিনোদিনী পুনরায় তুলসীমঞ্চের সম্মুখে জপ করিতে বসিল। অর্দ্ধদণ্ড পরে পাগলিনী দূর হইতে মা মা রবে চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল,

বৈষ্ণবী আবার উঠিয়া দাঁড়াইল। দূর হইতে পাগলিনীর কাতর আহ্বান শুনা যাইতেছিল, বিনোদিনীর মুখ শুকাইয়া গেল। পাগলিনী ছুটিয়া আসিয়া বৈষ্ণবীর কণ্ঠলগ্না হইল, সঙ্গে সঙ্গে পল্লীর স্ত্রী পুরুষে ক্ষুদ্র অঙ্গন ভরিয়া গেল। বিনোদিনী বৈষ্ণবীর পালিতা কন্যা বলিয়া অনেকে তাহাকে চিনিত; তাহারা বিনোদিনীকে ভয় করিত, কিন্তু সে পাগল বলিয়া তাহাকে ভালবাসিত। পাগলিনী বৈষ্ণবীর বুকে মুখ লুকাইয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল; কিন্তু তাহার প্রতি চারিদিক হইতে যে অজস্র প্রশ্রবাণ বর্ষিত হইতেছিল সে তাহার উত্তর দিল না।

অনেকক্ষণ পরে বিনোদিনী তাহাকে ঘরে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি হইয়াছে মা? কাঁদিলে কেন?” পাগলিনী আবার কাঁদিয়া উঠিল, কিন্তু এইবার সে কথা কহিল। সে বলিল, “মা, সে আসিয়াছে।” বৈষ্ণবী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, “কে আসিয়াছে মা?” “সেই যে, সে।” “সে কে, সে তোমার কে হয়?” “তাহা জানি না, কিন্তু তাহাকে চিনি, সেই সে।” “তাহাকে কোথায় দেখিলে? সে কোথায়?” “গঙ্গার ধারে ঘাসের উপরে শুইয়া আছে।” “তাহাকে ডাকিয়া আনি নি না কেন মা?” “কত ডাকিলাম, সেত উঠিল না মা।” “তাহার নাম কি?” “তাহা মনে নাই।” “তাহার নিবাস কোথায়?” “কেন আমাদের গ্রামে? “কোন্ গ্রামে?” “তাহা মনে

নাই, সেও গঙ্গার ধারে।” “চল দেখি, তাহাকে দেখিয়া আসি।”

বিনোদিনী বৈষ্ণবী মালা লইয়াই নবাগতকে দেখিতে চলিল; তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশী স্ত্রী পুরুষ অনেকেই চলিল। সকলে গঙ্গাতীরে গিয়া দেখিল যে হরিৎবর্ণ কোমল শম্পশয্যায় একটি গৌরবর্ণ যুবক পড়িয়া রহিয়াছে। যুবকের সর্বাঙ্গে অজ্ঞাঘাতের চিহ্ন, তাহা বহু রক্তাক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ডে আবদ্ধ। মৃতদেহ মনে করিয়া কেহই তাহার নিকটবর্তী হইল না, কেবল পাগলিনী তাহার পার্শ্বে গিয়া বসিল। সে আহত যুবকের দক্ষিণ হস্ত উঠাইয়া লইয়া কহিল, “মরে নাই, তোমরা দূরে দাঁড়াইয়া আছ কেন? মা, ইহাকে বাড়ী লইয়া চল।”

পাগলিনীর নিকট আশ্বাস পাইয়া বৈষ্ণবী ধীরে ধীরে যুবকের নিকটে আসিল এবং তাঁহার মস্তক ক্রোড়ে উঠাইয়া লইল। সে পরীক্ষা করিয়া দেখিল যে যুবক সত্য সত্যই মরে নাই, তখনও ধীরে ধীরে শ্বাস বহিতেছে। বৈষ্ণবীর অমুরোধে দুই চারি জন পুরুষ আসিয়া আহত ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিল, সকলেই বলিল যে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া তখনও বন্ধ হয় নাই; তখন সকলে মিলিয়া যুবককে বৈষ্ণবীর গৃহে লইয়া গেল।

যুবক তাহার গৃহে আসিলে বৈষ্ণবী তাহাকে নিজের পালকে শোয়াইল, এবং তাহার ক্ষত স্থান পরিষ্কার করিয়া

শুষ্ক বস্ত্র পরাইয়া দিল। পাগলিনীকে রোগীর শিয়রে বসাইয়া বিনোদিনী হকিম ডাকিতে গেল। তাহা শুনিয়া একজন প্রতিবেশিনী কহিল, “ফিরিজি মহলে ত বিনোদিনীর একচেটিয়া পসার, একটা ফিরিজি হকিম ডাকিয়া আনিল না কেন? তাহা হইলে দুদিনে সারিয়া যাইত।” পাগলিনী ব্যগ্র হইয়া তাহাকে কহিল, “মা, তুমি গিয়া ফিরিজি হকিম ডাকিয়া আন না।” উত্তরে প্রতিবেশিনী হাত নাড়িয়া, মুখ নাড়িয়া, কঙ্কন বলয় নাড়িয়া, সরলা পাগলিনীকে বুঝাইয়া দিল যে জন্ত বিনোদিনী বৈষ্ণবীর ছগলীর ফিরিজি মহলে এত পসার তাহা তাহার পুণ্যময় বংশে উদ্ধতন বা অধস্তন চতুর্দশ পুরুষে হইবে না। প্রতিবেশিনী গর্জ্জন করিতে করিতে চলিয়া গেল; পাগলিনী আহত যুবককে লইয়া বসিয়া রহিল।

বহুক্ষণ পরে যুবক চক্ষু মেলিল, তখন পাগলিনী তাহার শিয়রে বসিয়া ব্যঞ্জন করিতেছিল। যুবক তাহাকে দেখিয়া কহিল, “ললিতা, তবে স্বপ্ন নহে?” পাগলিনী তাহার কথা বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিতা হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। যুবক আবার কহিল, “তুমি এ বেশ কোথায় পাইলে ললিতা?”

একমাস পাগলিনীকে কেহ ললিতা বলিয়া সম্বোধন করে নাই। বহুদিন পরে নাম শুনিয়া ললিতার সম্মুখ হইতে যেন একটা ঘন আবরণ ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতে লাগিল। নাম শুনিয়া তাহার মনে পড়িয়া গেল যে তাহারই এই নাম।

পাগলিনী বা ললিতা কহিল, “তুমি কি বলিতেছ আমি বুঝিতে পারিতেছি না।” যুবক জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি পেশোয়ার ও ওড়না কোথায় ফেলিলে? তোমাকে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল।” ললিতা বিস্মিত হইয়া বলিল, “তুমি কি বলিতেছ? সে কাহাকে বলে?” “তুমিত বজরায় পেশোয়ার পরিয়া আসিয়াছিলে? তোমার হাতে সেতারে সিকু, ভুপালী বড় মিষ্ট লাগিতেছিল। ললিতা, তুমি সেতার বাজাইতে শিখিলে কবে?” “আমিত সেতার বাজাইতে জানি না।” “বজরায় কেমন করিয়া বাজাইতেছিলে?” “বজরা? কোথায় বজরা?” “তবে কি সমস্তই স্বপ্ন?”

আহত যুবকের ক্ষীণ মানসিক শক্তি এই কঠিন সমস্যা পূরণ করিতে পারিল না। যুবক চক্ষু মূদ্রিত করিল; তাহার কর্ণে শত ভ্রমরগুঞ্জন শব্দ বাজিতে লাগিল, সে ক্রমে অচেতন হইয়া পড়িল। অর্দ্ধদণ্ড পরে যখন ময়ূখের চেতনা ফিরিল, তখনও ললিতা তাহার শিয়রে বসিয়া ব্যজন করিতেছিলেন। ময়ূখ চক্ষু মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ললিতা, আমি কি ঘুমাইয়া ছিলাম?” ললিতা কহিলেন, “হাঁ।” “কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম?” “প্রায় অর্দ্ধদণ্ড।” “ললিতা, আমরা কোথায় আসিয়াছি? এ কি ভীমেশ্বর না গৌরীপুর?”

ভীমেশ্বর! গৌরীপুর!! ললিতার স্মৃতিপটের সন্মুখ হইতে যবনিকা আরও কিঞ্চিৎ সরিয়া গেল। ভীমেশ্বর, গৌরীপুর, কলনাদিনী জাহ্নবী, জীর্ণ পুরাতন ঘাট, সর্বনাশ।

ফিরিঙ্গি, তাহার পরে কুয়াসা, ঘন অন্ধকার, তাহার পরে ললিতা আর কিছুই জানে না।

এই সময়ে বিনোদিনী বৈষ্ণ লইয়া ফিরিয়া আসিল। বৈষ্ণকে দেখিয়া ললিতা অবগুষ্ঠন টানিয়া দিলেন। বৈষ্ণবী তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইল; কিন্তু কিছু বলিল না। বৈষ্ণ আসিয়া রোগীর নাড়ি টিপিল, প্রলেপ ও ঔষধের ব্যবস্থা করিল, এক আসুর্ফি দক্ষিণা লইয়া বিদায় হইল। তখন বৈষ্ণবী কহিল, “মা, হুগলী সহরের নেড়ে হকিম গুলা সব মরিয়াছে; সপ্তগ্রামের হাক্কামার ভয়ে হুগলী সহর ছাড়িয়া পলাইয়াছে; তাই একটা বৈষ্ণ ধরিয়া আনিলাম। কিন্তু পাগ্‌লী মা, আজ যে তুই বড় মাথায় কাপড় দিয়াছিস?”

হৃদয়ের উদ্বেগ আর বাধা মানিল না; মুণালকোমল ভুজ-যুগলে আশ্রয়দাতৃর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া রোদন করিতে করিতে ললিতা কহিলেন, “মা, তুই কে মা? আমি কোথায় আসিয়াছি? এতদিনে আমার চোখের সম্মুখ হইতে পর্দা সরিয়া গিয়াছে; আমি গৌরীপুরের রাধামোহন গোস্বামীর কণ্ঠা, ভীমেশ্বরের ঘাট হইতে হার্মাদে আমাকে ধরিয়া আনিয়াছিল; আমি কোথায় আসিয়াছি মা?”

বৈষ্ণবী তাহার কথা শুনিয়া শিরে করাঘাত করিয়া বসিয়া পড়িল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

রোমক স্বর্গের পথ

বিনোদিনী যখন বৈজ্ঞ লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল, তখন হুগলীর দুর্গ মধ্যে অন্ধকারময় কক্ষে জনৈক খৃষ্টীয় ধর্মযাজক দুই জন পাপীকে প্রেমময় ত্রাতার কাহিনী শুনাইতেছিলেন। পাপীদ্বয়ের মধ্যে একজন স্থূলাকার মশীকৃষ্ণবর্ণ, সে কোন কথা শুনিতেছিল না; দ্বিতীয় পাপী দীর্ঘাকার, শ্রামবর্ণ, কৃশকায়, সে নিবিষ্ট মনে পাদ্রীর সকল কথা শুনিয়া যাইতেছিল। স্থূলকায় পাপী কোন কথা শুনিতেছে না দেখিয়া পাদ্রী রাগিল। আরও দুই একবার চেষ্টা করিয়া সে কহিল, “চৈতন্যদাস, তুমি আমার পবিত্র কথা শুনিতেছ না, তোমার অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে।” চৈতন্যদাস হাসিমুখে কহিল “সাহেব, যখন জন্মিয়াছি তখন হইতে দুঃখ পাইতেছি, বৈরাগী হইয়া যখন অর্থলোভ ত্যাগ করিতে পারি নাই, তখন দুঃখ পাইব না কেন? মারিতে হয় মার, যাহা ইচ্ছা কর, আমি অখাণ্ড থাইতে পারিব না।” পাদ্রী কহিল, “তুমি অখাণ্ড থাইও না, কিন্তু ভ্রাণকর্তার নির্দিষ্ট পথ অবলম্বন কর।”

“সাহেব, যে পথ অবলম্বন করিয়াছি, তাহার কর্তব্যই শেষ করিয়া উঠিতে পারিলাম না, নূতন পথ অবলম্বন করিবার কি হইবে ? সাহেব, তোমার খৃষ্টও দেবতা, আমার কৃষ্ণও দেবতা ; তবে কেন আমাকে পীড়ন করিতেছ ?”

“তোমার কৃষ্ণ দেবতা নহে, মামুষ. মিথ্যাবাদী, লম্পট—”

চৈতন্যদাস কর্ণে অঙ্গুলী দিয়া কহিল, “কৃষ্ণনিন্দা শুনিতে নাই। পাত্রী, তোমার যাহা ইচ্ছা কর, আমার যে কৃষ্ণ আছে তাহাই থাক।”

পাত্রী ক্রুদ্ধ হইয়া যমদূতসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ দুই জন ফিরিজিকে ডাকিল। তাহারা আসিয়া একখানি বৃহদাকার চক্রে চৈতন্যদাসকে বাঁধিল, তাহা দেখিয়া দ্বিতীয় পাত্রী চক্ষু মুদিল। চক্রে আবদ্ধ হইয়া চৈতন্যদাস মুদ্রিত নেত্রে বলিতোঁছিল, “হরিবোল, হরিবোল, জয় রাধে কৃষ্ণ।” পাত্রী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল “তুমি কি বলিতেছ ?” কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বর চৈতন্যদাসের কর্ণে প্রবেশ করিল না। পাত্রী ক্রুদ্ধ হইয়া অল্পচরদিগকে চক্র ঘুরাইতে আদেশ করিল। চক্র ঘূর্ণিত হইল ; সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যদাসের হস্তের ও পদের অস্থি চূর্ণ হইল। ভীষণ যজ্ঞণায় বৈষ্ণবের নয়নকোণ হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল ; কিন্তু সে অধীরতা প্রকাশ করিল না, তাহার মুখ হইতে যজ্ঞণাব্যঞ্জক একটি শব্দও নির্গত হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে চৈতন্যদাস গদগদ কণ্ঠে বলিল, “আর একবার দাঁড়াও, যজ্ঞণা নাই, ক্রেশ নাই, প্রভু, ঐকুপ

আর, একবার দেখাও।” তাহার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের ভয় দূর হইল, তিনি চক্রে নিকটে গিয়া চৈতন্যদাসের অঙ্গ স্পর্শ করিলেন। চৈতন্যদাস বলিয়া উঠিল, “এ ত তোমার স্পর্শ নয় প্রভু! এ কাহার কঠোর করস্পর্শ! রাধাবিনোদ তোমার নব-নীত কোমল করকমল আর একবার আমার অঙ্গে বুলাইয়া দাও। মধুসূদন, মধু, মধু।” ব্রাহ্মণ ভিজ্জাসা করিলেন, “চৈতন্যদাস কি দেখিতেছে?” বৈরাগী নয়ন মুদিত রাখিয়াই কহিল, “ঠাকুর, বড় সুন্দর বড় সুন্দর, আর ভয় নাই। রাধাবিনোদ আসিয়াছেন, আমার শিয়রে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার করস্পর্শে আমার সকল যাতনা দূর হইয়াছে।” সহসা ব্রাহ্মণের দেহ রোমাঞ্চিত হইল, তাঁহার মনে হইল যেন কাহার ছায়া চক্রে আবদ্ধ বৈষ্ণব-দেহের চারিপার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ব্রাহ্মণের সমস্ত দেহ কম্পিত হইল। তিনি ভূমিতে লুটাইয়া সেই অশরীরী ছায়াকে দূর হইতে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। চৈতন্যদাস বলিতে লাগিল, “রাধাবিনোদ, সমস্ত জীবনের সঞ্চিত কলুষরাশি মার্জনা করিয়া যদি দেখা দিলে তাহা হইলে আর একবার দাঁড়াও, শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত থাকিও।” গৃহতলে শয়ান ব্রাহ্মণের মনে হইল যে স্বর্গন্ধি ধূপধূমে কক্ষ আমোদিত হইয়াছে! ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের উদ্ভাদনায় উন্মত্ত হইয়া উঠিল, চৈতন্যদাসের রক্তসিক্ত চরণযুগল ধারণ করিয়া কহিল, “বৈরাগী, তুমি কি দেখিলে? সারা জীবনের ধ্যানেও যাহা নয়নপথে আসে নাই, সে দর্শনহর্ষ রূপ তুমি মুহূর্ত্তের আস্থানে কেমন করিয়া

দেখিতে পাইলে ? বৈষ্ণব, আমি ব্রাহ্মণ নহি, আমি চণ্ডাল, যেখানে চলিয়াছি সেখানে জাতিভেদ নাই, কুলমর্যাদা নাই। যাহা দেখিতেছ আমাকে একবার দেখাও।” বৈরাগী আবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, “দেখ, তুমিও দেখ।”

তখন ব্রাহ্মণের নয়নপথে ছায়ারূপ যেন সহসা শরীরী হইয়া উঠিল, অন্ধকারময় কক্ষের এক কোণ উজ্জ্বল শুভ্র আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, সেই ছায়ারূপ ক্রমে ক্রমে স্নন্দর স্তম্ভিত শ্রামরূপ ধারণ করিল ; রাধাবিনোদ বলিতে বৈষ্ণবে যাহা বুঝে ছায়া সেই শরীর ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের মানসচক্ষুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ব্রাহ্মণের মুদ্রিত নয়নের কোণে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল ; তাহা দেখিয়া পাদ্রী ও তাহার অনুচরদ্বয় বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

সেই সময়ে আর একজন ফিরিজি যুবা সেই অন্ধকারময় কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, “আলভারেজ্ !” পাদ্রী ব্যস্ত হইয়া কক্ষের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল। যুবা তাহাকে কহিল, “তোমার রক্তপিপাসা কি এখনও মিটে নাই ? তুমি আমার আদেশ না লইয়া বন্দীদিগকে কেন কারাগার হইতে লইয়া আসিয়াছ ?” পাদ্রী লজ্জিত হইয়া কহিল, “পৌত্তলিক-দলনে পুরোহিতের আদেশই গ্রাহ্য, তাহার জন্ত যে শাসনকর্ত্তার আদেশ লইতে হয় তাহা জানিতাম না।”

“তুমি কি বন্দীদিগকে যজ্ঞগা দিতে আরম্ভ করিয়াছ ?”

“এই দুইজন বন্দী শয়তানের অনুচর, ইহাদিগের জন্ত ভারতবর্ষের লোকে প্রকৃত ধর্ম গ্রহণ করিতেছে না।”

যুবা অগ্রসর হইয়া চক্রে আবদ্ধ বৈষ্ণব ও তাহার পার্শ্বে ধূলায় লুষ্ঠিত ব্রাহ্মণকে দেখিয়া অঙ্গুলী হেলন করিল। পাদ্রীর অনুচরদ্বয় তৎক্ষণাৎ চৈতন্যদাসের বন্ধন মোচন করিল, কিন্তু চৈতন্যদাস দাঁড়াইতে পারিল না, তাহার দেহ ধূলায় লুষ্ঠিত হইল। তাহা দেখিয়া যুবা পাদ্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, “ইহাকে কি হত্যা করিয়াছ?” পাদ্রী কহিল, আপনি শাসনকর্ত্তা, সেই জন্ত সম্মান করিতেছি, আমি আমার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছি, কোনও শাসনকর্ত্তার নিকটে আমি কৃত কার্য্যের জন্ত দায়ী নহি, স্বয়ং রাজাও আমার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। ঈশ্বরের প্রতিনিধি আমার একমাত্র প্রভু।”

“পাদ্রী, তুমি জান, ইহা স্পেন্‌নহে, ইহা ভারতবর্ষ? জান যে এই দুইজন পৌত্তলিক আমাদের প্রজা নহে?” “জানি।”
 “তুমি জান এই হুগলী বন্দর সমর বিভাগের কর্ত্তৃত্বাধীন? তুমি জান যে এখানে তোমাদিগের আইন প্রচলিত নহে?” “জানি।”
 “তোমার স্বরণ আছে যে তুমি সত্য ধর্ম প্রচার করিতে আসিয়াছ, নরহত্যা করিতে বা দেশ শাসন করিতে আস নাই?”
 “জানি।” “তবে তুমি নরহত্যা করিয়াছ কেন?” “সত্য ধর্ম প্রচারের জন্ত যাহা আবশ্যক তাহা করিয়াছি। ডিম্‌জা, এখন তুমি আমীরাল, স্বরণ রাখিও যে একদিন স্পেনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে।”

“পাদ্রী, আমি সৈনিক, সর্বদা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত। ভরসা করি, তোমার রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিবার পূর্বে আমার মৃত্যু হইবে। আলভারেজ্, তুমি নরঘাতী পিশাচ, ঈশার পবিত্র ধর্ম তোমার গ্রায চণ্ডালের জন্ত ভারতবর্ষে নিন্দিত ও ঘৃণিত হইয়াছে, একদিন তোমাদিগের জন্ত পর্তুগীজ্ সাম্রাজ্য বিনষ্ট হইবে। যাহা করিয়াছ তাহা আমার অধিকারে দ্বিতীয় বার হইবে না।” “কেন হইবে না?” “আমার আদেশ।” “কোনও খৃষ্টান্ আমার আদেশ অবহেলা করিতে ভরসা করিবে না।” “পাদ্রী, আমার আদেশের বিরুদ্ধে হগলীর কোন পর্তুগীজ্ তোমার আজ্ঞা পালন করিবে না।” “যাহারা পালন না করিবে তাহারা সমুচিত দণ্ড পাইবে।”

এই সময়ে আর একজন ফিরিজি যুবা দ্বারে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আমীরাল্ কি এখানে আছেন?” ডিস্কজা কহিলেন, “আছি, কি হইয়াছে?” যুবা কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল, “আমীরাল্, কল্যা ডাকুনহা যে বজরা মারিয়াছিল তাহা নবাব সাহ নওয়াজ খাঁর বজরা, আমি কারাগারে গিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসিয়াছি।” “সাহ নওয়াজ খাঁ কে?” “শাহজাদা শাহজহানের একজন প্রধান অনুচর। এখনই তাঁহাকে মুক্ত করুন, নতুবা মুহূর্ত্ত মধ্যে ভারতবর্ষে পর্তুগীজ্ অধিকার বিলুপ্ত হইবে।”

ডিস্কজা পাদ্রীর অনুচরদ্বয়কে কহিলেন, “এই দুইজন বন্দীকে বিনোদিনী বৈষ্ণবীর গৃহে লইয়া যাও। পাদ্রী আল-

ভারেজ্ এখন হইতে বন্দী, তাঁহার অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিও না, কিন্তু তাঁহাকে নজরবন্দী রাখিও ।”

ডিম্বজা আগন্তকের সহিত কক্ষ পরিত্যাগ করিল । একজন ফিরিজি চৈতন্যদাসকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইল, দ্বিতীয় ব্যক্তি ব্রাহ্মণের দেহ স্পর্শ করিল । ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথায় যাইতে হইবে ?” ফিরিজি অঙ্গুলী দিয়া দ্বার দেখাইল, ব্রাহ্মণ ফিরিজিগণের সহিত কক্ষ ত্যাগ করিল ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ভাগ্যচক্র

সপ্তগ্রামের দুর্গমধ্যে তোরণের পশ্চাতে আমীর-উল-বহর . আসদ্ খাঁ বিষন্ন বদনে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার পশ্চাতে রাদন্ দাজখাঁ, আলীনকী খাঁ প্রমুখ মুসলমান সেনানায়ক ও শেঠ গোকুলবিহারী, তাহার পুত্র গোষ্ঠবিহারী, চিন্তামণি মজুমদার, হরিনারায়ণ শীল প্রভৃতি সপ্তগ্রামের প্রধানগণ দাঁড়াইয়া আছেন । সকলের মুখই বিষন্ন, আহত সেনাগণ আসদ্ খাঁর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, আসদ্ খাঁ তখনও ময়ূধের সন্ধান করিতেছেন । গোকুলবিহারী বলিলেন, “হজুর, সপ্তগ্রামের লোকে যখন শুনিল যে ফিরিজির ভয়ে ফৌজদার কলিমুল্লা খাঁ

পলাইয়াছেন, তখন লোকে সমস্ত আশা ভরসা বিসর্জন দিয়া মরণের জন্য প্রস্তুত হইল। ফৌজদারী সেনা পলায়নের উত্থোগ করিতেছিল, তখন সেই সিংহবিক্রম যুবা সাহস দিয়া ভরসা দিয়া সপ্তগ্রাম রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিল ; সেই ডাকুন্‌হার তোপ দখল করিয়াছিল, তাহার ভয়ে কুটিন্‌হোর বহর কিল্লার সম্মুখে আসিতে পারে নাই ; সেই জন্য ত্রিবেণী রক্ষা হইয়াছিল ; তাহারই উপদেশে আমি ডিহুজাকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। কে জানিত যে আর তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না !” আসদ্ খাঁ কহিলেন, “হরিনারায়ণ, সেই যুবা কে জান ?”

হরি। না ছজুর।

আসদ্। সে দেবেন্দ্রনারায়ণের পুত্র।

চিন্তামণি। কে ? ভীমেশ্বরের মহারাজ দেবেন্দ্রনারায়ণ ?

আসদ্। হাঁ, যাহার বীরত্ব দেখিয়া একদিন শাহজাদা খুর্রমও বিস্মিত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে একজন হরকরা আসিয়া কহিল, “বন্দানওয়াজ, হকিম আবুতোরাব খাঁ জনাবের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন।” আসদ্ খাঁ কহিলেন, “লইয়া আইস।” ক্ষণকাল পরে হরকরার সহিত সেই বৃদ্ধ হকিম আসিয়া আসদ্ খাঁকে অভিবাদন করিলেন। আসদ্ খাঁ কহিলেন, “হকিম সাহেব, আজি সপ্তগ্রামে হকিমের বড়ই প্রয়োজন।”

“জনাব, বন্দা বাদশাহের কার্ধ্যের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত। শুনিলাম যে এক কাকের যুবা ফিরিজির সহিত লড়াই করিয়া

সপ্তগ্রাম রক্ষা করিয়াছিল, আপনি নাকি তাঁহার সন্ধান করিতেছেন ?”

“হাঁ হকিম, সে যুবা কাফের হইলেও বীর এবং সে আমার বন্ধুপুত্র। আপনি কি তাহার সন্ধান পাইয়াছেন ?” “কল্য সন্ধ্যাকালে শাহ্নওয়াজখাঁর বজ্রায় এক গোরবর্ণ যুবকের চিকিৎসা করিতে গিয়াছিলাম, তাহার পোষাক দেখিয়া তাহাকে কাফের বলিয়াই বোধ হইল।” তাহার আকার কিরূপ ?” “গোরবর্ণ, দীর্ঘাকার, বলিষ্ঠদেহ।” “তাহার নাসিকায় কি অস্ত্রক্ষতের চিহ্ন আছে ?” “আছে।” “সেইই, চিন্তামণি, নবাব শাহ্নওয়াজ খাঁ কোথায় ?”

রাদন্দাজ খাঁ কহিলেন, “কল্য সন্ধ্যাকালে পিতা বজ্রায় সপ্তগ্রাম ত্যাগ করিয়াছেন, তাহার পর আর তাঁহাদিগের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।” চিন্তামণি মজুমদার কহিলেন, “বন্দরের দারোগা সংবাদ দিয়াছে যে কল্য সমস্ত রাত্রি কোন নৌকা বা বজ্রা হুগলী হইতে সপ্তগ্রামের দিকে আসে নাই।”

আসদ্। হরিনারায়ণ, তুমি নাওয়ারার একখানি কোশা লইয়া দক্ষিণদিকে যাও, দেখ সপ্তগ্রাম অবধি শাহ্নওয়াজখাঁর বজ্রা দেখিতে পাওয়া যায় কিনা ? রাদন্দাজ খাঁ, আপনি ত্রিবেণীর বন্দরে গিয়া নাওয়ারার যে কয়খানি ছিপ্ ও কোশা আছে তাহা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখুন, আবশ্যক হইলে অদ্যই হুগলী আক্রমণ করিতে হইবে।

রাদন্দাজ। আমার পিতার সহিত আমার স্ত্রী আছেন,

তাঁহাকে রক্ষা করিতে হইলে এখনই হুগলী আক্রমণ করা আবশ্যক।

আসদ্। এক প্রহরের মধ্যে হুগলী আক্রমণ করিব।
গোকুলবিহারী, তোমার সেনা প্রস্তুত আছে ?

গোকুল। হুজুর, আমার সেনা সারারাত্রি সপ্তগ্রাম পাহারা দিয়াছে, তাহারা কেহ গৃহে ফিরিয়া যায় নাই। ফৌজদারী আহদী সেনা প্রস্তুত হইতে বিলম্ব হইবে।

আসদ্। আলীনকী খাঁ, আপনার সেনা কি প্রস্তুত নাই ?

আলী। না, তবে একপ্রহরের মধ্যে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে।

আসদ্। আমাদের সমস্তই আছে, কেবল তোপ নাই। নাওয়ারা যদি জহাঙ্গীরনগরে না পাঠাইয়া দিতাম তাহা হইলে হয়ত সপ্তাহ মধ্যে হুগলী দুর্গ অধিকার করিতে পারিতাম; কিন্তু কেবল দখল উপযোগী একটি তোপও নাই।

গোকুল। একটা সুবিধা আছে, ফিরিঙ্গির জাহাজ সমস্ত হিজলীতে আটক থাকিবে, কারণ এ বৎসর গঙ্গার জল বাড়ে নাই।

এই সময়ে হরকরা আসিয়া সংবাদ দিল যে জহাঙ্গীর নগর হইতে দেওয়ান হরেকৃষ্ণ রায় আসিয়াছেন, তিনি এখনই সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। আসদ্ খাঁ বিস্মিত হইয়া কহিলেন, “খালসার দেওয়ান হরেকৃষ্ণ রায় জহাঙ্গীর নগর ছাড়িয়া সপ্তগ্রামে আসিল কেন ? রাদন্দাজ খাঁ, দেওয়ান হরেকৃষ্ণ সেহাজারী মনসব্দার ;

তুমি কলিমুল্লাখাঁর তরফ্ হইতে তাঁহাকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আইস।”

হরকরা ও রাদন্দাজ খাঁ প্রস্থান করিলেন ও ক্ষণকাল পরে সুবা বাদশাহার রাজস্ব বিভাগের দেওয়ান হরেকৃষ্ণ রায়কে সঙ্গে লইয়া আসদখাঁর নিকটে ফিরিয়া আসিলেন। দেওয়ান যথারীতি অভিবাদন করিয়া কহিলেন, “জনাবে আলী, নবাব নাজিম নবাব মকরমখাঁর ফৌৎ হইয়াছে, শাহান শাহ্, বাদশাহের আদেশ ইক্লিম্ বাদশাহায় যতদিন না পৌঁছে ততদিন আপনিই সুবা বাদশাহা বিহার ও উড়িষ্যার স্ববাদার।” দেওয়ান হরেকৃষ্ণ এই বলিয়া পুনরায় অভিবাদন করিলেন। আসদখাঁ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি প্রকারে নাজিম নবাব মকরম খাঁর ফৌৎ হইল?” হরেকৃষ্ণ পুনরায় কুর্গিস করিয়া নিবেদন করিলেন, “নবাব নাজিম বজ্রায় সফর করিতে গিয়াছিলেন, হঠাৎ ঝড় উঠিয়া বজ্রা মারা গিয়াছে।”

“উড়িষ্যা বা বিহারের ফৌজদারকে সংবাদ দিলে না কেন?” “আপনি ব্যতীত সুবা বাদশাহা উড়িষ্যায় পঞ্চাহাজারী মনসব্দার আর কেহ নাই।”

হরেকৃষ্ণ রায়ের আদেশে স্ববাদারের চিহ্নস্বরূপ ছত্র, নিশান, আশা, সোটা, দুর্কীশ্, মহি, মরাতব প্রভৃতি রাজচিহ্ন আনীত হইল। হরিনারায়ণ শীল পেশ্কার স্বরূপ উড়িষ্যা, জহাঙ্গীর নগর, সপ্তগ্রাম ও পাটনার নায়েব নাজিমদিগকে নবাব আসদখাঁর নাজিমী গ্রহণ সংবাদ জানাইয়া পত্র

লিখিলেন। চিন্তামণি মজুমদার মীর মুনসী রূপে বাদশাহের দরবারে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। তখন আসদুখা কহিলেন, “দেওয়ানজী, তুমি যদি নাজিমী না আনিয়া নাওয়ারার এক-খানা গরাব্ বা দুইটা বড় তোপ আনিতে তাহা হইলে বড় খুসী হইতাম, আমি এখন হুগলী আক্রমণ করিতে যাইতেছি।”

“কেন হুজুর?”

“তিন দিন পূর্বে হুগলীর ফিরিজিরা সপ্তগ্রাম আক্রমণ করিয়াছিল, বহুকষ্টে বাদশাহী বন্দর রক্ষা করিয়াছি, কল্য সন্ধ্যাকালে নবাব শাহনওয়াজ খাঁ হজরৎ জলালী পুত্রবধূ লইয়া বজরায় সফর করিতে গিয়াছেন আর ফিরিয়া আসেন নাই, সম্ভবতঃ ফিরিজি হার্মাদ্ তাহার বজ্রা মারিয়াছে।”

“এইবার হুজুর যখন স্বয়ং নিজাম হইয়াছেন, তখন বাঙ্গালা মুলুক হার্মাদের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবে।” “দেওয়ান, যে কয়দিন আমি নাজিম থাকিব, সে কয়দিন হার্মাদের অত্যাচার নিবারণ করিব বটে, কিন্তু তাহার পরে খোদাতালাার ইচ্ছা আর শাহন শাহ্ বাদশাহের মর্জি।”

এই সময়ে দুর্গের তোরণে দামামা বাজিয়া উঠিল, ফৌজদারী আহুদীসেনা সজ্জিত হইয়া বাহির হইল। নবাব নাজিম কহিলেন, “দেওয়ানজী, আপনি এখন বিশ্রাম করুন।” যদি হুগলী হইতে ফিরিয়া আসি তাহা হইলে জহাঙ্গীর নগর যাইব।”

নবাব নাজিম, আলীনকী খাঁ ও গোষ্ঠবিহারী দুর্গ হইতে

যাত্রা করিলেন। দুর্গের তোরণে একজন বৃদ্ধ ধীবর নবাব নাজিমকে অভিবাদন করিল। আহদীরা তাহাকে তাড়াইয়া দিতে ছিল, কিন্তু আসদু খাঁ তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া কহিলেন, “বৃদ্ধ কি বলিতে আসিয়াছে বলিতে দাও।” তখন বৃদ্ধ অগ্রসর হইয়া কহিল, “হজুর, আমি বুড়া মানুষ, চোখে ভাল দেখিতে পাই না। আমি ভীমেশ্বরের স্বর্গীয় মহারাজ দেবেন্দ্রনারায়ণের নৌকায় ছিলাম, বড় বিপদে পড়িয়া আপনার নিকটে আসিয়াছি।”

আসদু খাঁ বিস্মিত হইয়া কহিলেন, “দেবেন্দ্রনারায়ণ? তুমি কি তাহার পুত্রের সহিত আসিয়াছিলে?” উত্তর দিবার পূর্বে ভুবন আসদুখাঁর মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিল, তাহার পরে ধীরে ধীরে কহিল, “হজুর, আমি বুড়া মানুষ, ছোটলোক, আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আপনি কি আসদু খাঁ? পিপলী ও আকবরনগরের যুদ্ধে আপনাকে দেখিয়াছি।” আসদু খাঁ হাসিয়া কহিলেন, “আমিই আসদু খাঁ। তুমি দেবেন্দ্রনারায়ণের পুত্রের সংবাদ বলিতে পার?”

ভুবন আসদুখাঁর পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া কহিল, “হজুর, সেই সংবাদ লইয়াই আসিয়াছি।”

ভুবন গৌরীপুরের ঘাট হইতে ললিতাহরণের কাহিনী, ময়ূধের যাত্রা প্রভৃতি সমস্ত বলিয়া গেল। অবশেষে সে কহিল, “সেই বুড়া আমীরের নৌকা হইতে মহারাজ যখন আমাকে ডাকিলেন তখনই হান্সাদের কেল্লার গোলা বজ্রা ও আমাদের

নৌকা ডুবাইয়া দিল। আমাদের নৌকার ভট্টাচার্য্য মহাশয়, এক বৈরাগী ও দুই তিন জন লোক ধরা পড়িয়াছিল, কিন্তু বজ্রার সকলেই বন্দী হইয়াছে।” আসদ্ খাঁ জিজ্ঞাসা করিলেন, “বজ্রা হুগলীতে গেল কেন?”

“হাশ্মাদের ছিপ্ ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল।” “আলীনকী খাঁ, সমস্তই শুনিলে, এখন হুগলী আক্রমণ করা ব্যতীত উপায় নাই।”

এই সময়ে আসদ্ খাঁ দেখিলেন যে, দূরে একজন বৃদ্ধ মুসলমান রাদন্দাজ খাঁর সহিত দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছেন। নাজিম বলিয়া উঠিলেন, “শোভান আল্লা, নবাব শাহ্‌নওয়াজ খাঁ ফিরিজির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন।” শাহ্‌নওয়াজ খাঁ আসিয়া বলিলেন যে ফিরিজি আমীর-উল্-বহর ডিঙ্গুজা তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। তখন আসদ্ খাঁ দুর্গে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

পরিচয়

বিনোদিনীকে আর্ন্তনাদ করিয়া বসিয়া পড়িতে দেখিয়া, ললিতা ছুটিয়া আসিয়া তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিল এবং জিজ্ঞাসা

করিল, “কি হইয়াছে মা ? এমন করিলি কেন মা ?” বিনোদিনী উত্তর দিল না, ললিতাকে আলিঙ্গন করিয়া কঁাদিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ললিতার চক্ষুও জলে ভরিয়া আসিল, উভয়ে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে রোদন করিল। ময়ূখ কিছু বুঝিতে না পারিয়া ক্ষণকাল পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ললিতা, কঁাদিতেছ কেন ? তোমাদের কি হইয়াছে ?” উত্তর না পাইয়া তিনি পুনর্বার ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন বিনোদিনী চক্ষু মুছিয়া কহিল, “মা, সমস্ত পরিচয় *দিতেছি, আগে তোমাদের পরিচয় লই। উনি কি জামাই ?”

ললিতার মুখ লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, সে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া কহিল, “ছি, তা কেন ? উনি ভীমেশ্বরের রাজার ছেলে। গৌরীপুরের ঘাটে যখন আমাকে হান্সাদে ধরে, তখন উনি নৌকায় বসিয়া মাছ ধরিতেছিলেন।” “তবে তুই যে বড় উহাকে লইয়া আসিলি ?”

ললিতার রক্তবর্ণ মুখ লজ্জায় আরও লাল হইয়া উঠিল, সে কহিল, “তাহা বলিতে পারি না।” এই বলিয়া ললিতা মুখ ফিরাইল, বিনোদিনী তখন আর প্রশ্ন করিল না। ময়ূখ বুঝিলেন যে ছগলীতে তাহার উপস্থিতির কারণ নির্দেশ করার আবশ্যক হইয়াছে। তিনি খাটের উপর হইতে ললিতাহরণের বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন। ময়ূখের কথা শেষ হইলে বিনোদিনী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, “মা, রাধাবিনোদ তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন, তুমি ফিরিঙ্গীর হাতে পড়িয়াই পাগল

হইয়া গিয়াছিল, সেই জন্ত গঞ্জালিস্ তোমাকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। তোমাকে একলা ছগলীর পথে বেড়াইতে দেখিয়া আমি লইয়া আসিয়াছিলাম।”

“তুমি কে মা? তুমি আমার পরিচয় শুনিয়া কাদিয়া উঠিলে কেন?”

বিনোদিনী ললিতার প্রশ্ন শুনিয়া পুনরায় কাদিয়া উঠিল এবং তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া কহিল, “মা, যে দিন তোকে ধূলী কাদা মাখিয়া রক্ষ কেশে ছগলীর পথে পথে বেড়াইতে দেখিয়াছিলাম সেই দিনই বুঝিয়াছিলাম যে তুমি আমার আত্মীয়া, আমি খড়দহের তারানাথ ভট্টাচার্য্যের কণ্ঠা, তোর গর্ভধারিণী আমার সহোদরা।”

ললিতা বিস্মিত হইয়া বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, “মাসিমা, আপনি এখানে কেন? মায়ের মুখে কখনও মামার বাড়ীর নাম শুনি নাই, শুনিয়াছি আমার এক মামা ছিলেন, তিনি চৌদ্দ বৎসর পূর্বে সম্ভ্রাসী হইয়া গিয়াছেন।”

“চৌদ্দ বৎসর পূর্বে গঞ্জালিস্ আমাকে ও আমার ভ্রাতৃ-জামাকে খড়দহ হইতে ধরিয়া আনিয়াছিল। আমি বাল-বিধবা, তোমার মামী মরিয়া স্বর্গে গিয়াছেন, আর আমি পাপের পসরা বহিয়া মরিতেছি।” বিনোদিনী এই বলিয়া পুনরায় রোদন করিয়া উঠিল, ললিতা কি বলিবে স্থির করিতে না পারিয়া নিঃশব্দে ক্রন্দন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে

শান্ত হইয়া বিনোদিনী কহিল, “মা, এখন তোমার জ্ঞান হইয়াছে, ফিরিঙ্গীরা এ সংবাদ পাইলে এখনই তোমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে। তোমাকে এখন পলাইতে হইবে।” তাহার পরে ময়ূখের নিকে ফিরিয়া কহিল, “বাবা, তুমি যখন ললিতার জন্ত এত করিয়াছ, তখন আর একটু উপকার কর, তুমি ইহাকে লইয়া ভীমেশ্বরে ফিরিয়া যাও।” ময়ূখ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, “আমি উঠিতে পারিলেই লইয়া যাইব।” তাহা শুনিয়া ললিতা বলিয়া উঠিল, “মাসিমা, ভীমেশ্বরে কোথায় যাইব ? পিতা কি আমাকে গৃহে স্থান দিতে ভরসা করিবেন ?” বলিতে বলিতে ললিতার আকর্ণবিশ্রান্ত নীলেন্দীবরতুল্য নয়নযুগল জলে ভরিয়া আসিল। ময়ূখ কহিলেন, “ললিতা, গোস্বামী ঠাকুর তোমাকে গৃহে লইতে সম্মত হইলেও গ্রামের লোকে দিবে কি না সন্দেহ। হরিনাথ গঙ্গোপাধ্যায় আছে, মাধব গঙ্গোপাধ্যায় আছে, কালিদাস চট্টোপাধ্যায় আছে, তাহারা নিশ্চিন্ত থাকিবে না।” বিনোদিনী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, “তাহাও ত বটে, তবে কি উপায় হইবে ? বাবা, তুমি যখন ললিতাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছিলে তখন মনে কি স্থির করিয়াছিলে ?” “মা, এ সকল কথা একবারও মনে হয় নাই।”

বিনোদিনী মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে বসিল ; ক্ষণকাল পরে কহিল, “ললিতা যখন আমার আশ্রয়ে আসিয়া পড়িয়াছে তখন আমি তাহাকে ফেলিয়া দিতে পারি ন। এখানে

থাকিলেও তাহাকে রক্ষা করিতে পারিব না। বাবা, আমরা আগ্রা যাইব, আর কোথাও ফিরিঙ্গীর হাত হইতে ললিতাকে বাঁচাইতে পারিব না। বাবা, তুমি কি আমাদের সঙ্গে যাইবে?

ময়ূখ বলিলেন, “বাইব।”

সেই দিন হইতে বিনোদিনী আর ললিতাকে ঘরের বাহির হইতে দিল না। ময়ূখ স্তম্ভ হইলে সে এক নিশীথ রাত্রিতে তাহার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কুটির দ্বারারুদ্ধ করিয়া ললিতা ও ময়ূখের সহিত পলায়ন করিল। তাহার দুইদিন পরে ফৌজদারী সিপাহীর সহিত তর্করত্ন মহাশয় ও ভুবন আসিয়া ময়ূখ বা ললিতাকে দেখিতে পাইলেন না।

নাজিম্ আসদ্ খাঁ ভুবনের মুখে ময়ূখের সংবাদ পাইয়া, তর্করত্ন মহাশয় ও ভুবনকে সন্ধান লইবার জন্ত গোপনে হুগলী প্রেরণ করিয়াছিলেন। তর্করত্ন যখন সপ্তগ্রামে ফিরিলেন তখন শাহ্‌ওয়াজ্ খাঁ, আলীনকী খাঁ ও আসদ্ খাঁ পরামর্শ করিতেছিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নবাব নাজীমকে জানাইলেন যে, ময়ূখ জীবিত আছেন, রাধামোহন গোস্বামীর কন্যা ও তিনি হুগলীতে বিনোদিনী বৈষ্ণবীর গৃহে আশ্রয় পাইয়াছিলেন, কিন্তু দুই তিন দিন পূর্বে বিনোদিনী রাত্রিযোগে তাহাদিগকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে, কোথায় গিয়াছে কেহ বলিতে পারে না। সংবাদ শ্রবণ করিয়া শাহ্‌নওয়াজ্ খাঁ ও আসদ্ খাঁ বিষম বদনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। বহুকাল পরে আসদ্

খাঁ কুহিলেন, “নবাব, আপনি বাদশাহের দরবারে ফিরিয়া যান। শাহানুশাহ্ বাদশাহের আদেশে অপর কেহ যতক্ষণ বাঙ্গালার নাজিম নিযুক্ত না হইবেন, ততক্ষণ আমি জহাদীর নগরে থাকিতে বাধ্য, নূতন সুবাদার আসিলে আমিও আকবরাবাদ যাইব।” শাহ্‌নওয়াজ খাঁ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, “তাহাই হউক, রাদন্দাজ্ ও আমি কল্যাই সপ্তগ্রাম পরিত্যাগ করিব।”

“দেবেল্ল নারায়ণের যে কয়জন পুরাতন ভৃত্য ময়ূখের সন্ধানে আসিয়াছিল, তাহাদিগকে আপনার সহিত লইয়া যান, পথে মখ্‌সুসাবাদে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন। কাফের, তোমরা নবাব সাহেবের সহিত ফিরিয়া যাও, দেবেল্ল নারায়ণের পুত্র যদি কখনও ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে ভীমেশ্বরে সংবাদ পাঠাইব।”

তর্করত্ন মহাশয় কহিলেন, “হুজুর, আমি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ জাতি হিন্দুদিগের মধ্যে দেওয়ানা ফকীর বিশেষ। সংসারে আপনার বলিতে আমার কেহই নাই। যে দিন ভীমেশ্বর পরিত্যাগ করি, সেইদিন ভীমেশ্বর স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, যদি কখন প্রভুপুত্রের সহিত ফিরিতে পারি তাহা হইলে ভীমেশ্বরে ফিরিব, নতুবা কাশীবাস করিব। নবাব সাহেব আগ্রায় ফিরিবেন, আমাদের কয়জনকে সঙ্গে লইয়া গলে বড়ই বাধিত হইব।”

“কাফের, তুমি আগ্রায় গিয়া কি করিবে?”

“বাদশাহের দরবারে ফিরিঙ্গির অত্যাচারের কথা নিবেদন করিব।”

শাহ্নওয়াজ খাঁ বলিলেন, “উত্তম কথা, আমিও ফিরিঙ্গি হাশ্মাদের অত্যাচারের সাক্ষী বাদশাহের দরবারে উপস্থিত করিতে চাহি। এই কাফের মোল্লা আমার সহিত যাইতে প্রস্তুত আছে; পাদ্রী যে কাফের ফকীরকে পীড়ন করিয়াছিল তাহাকেও লইয়া যাইতে পারিলে ভাল হয়।”

আসদ্ খাঁ বলিলেন, “উত্তম।”

গুলরুখ্ সপ্তগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া রাদন্দাজ্ খাঁর গৃহে বাস করিতেছিলেন, তাঁহার ভৃত্যবর্গ একে একে ফিরিয়া আসিয়াছিল। গৃহে ফিরিয়া শাহ্নওয়াজ খাঁ গুলরুখকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা, আমরা কল্যা আগ্রা যাত্রা করিব, তোমরা কোথায় যাইবে?” যুবতী কহিল, “কোথায় যাইব তাহাত স্থির করি নাই? মনে করিতেছি, আপনার সহিত আগ্রায় যাইব।”

“চল, আমরা কল্যা প্রভাতে যাত্রা করিব।” “আমিও যাইব। আমার স্বামীর কোন সন্ধান পাওয়া গিয়াছে কি?” “গিয়াছে, তিনি হুগলীতে এক কাফের রমণীর গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন, পরে সে স্থান হইতে পলায়ন করিয়াছেন। মা, তোমার স্বামী কি কাফের ছিলেন?”

“ছিলেন, তিনি আমাকে বিবাহ করিবার জন্ত মুসলমান হইয়াছিলেন।” “তুমি কি তাঁহার পূর্ব পরিচয় জান?”

“না।” “তিনি রাঢ়দেশের এক জমীদারের পুত্র।” “হান্সাদেবের অত্যাচারের জন্ত বাদশাহ দেশ নিরাপদ নহে ; সেই জন্য মনে করিতেছি আগ্রায় গিয়া বাদশাহের দরবারে সমস্ত দুঃখ নিবেদন করিব। আমি আশ্রয়হীনা অনাথিনী,—একাকী বাদশাহ দেশে থাকিয়া স্বামীকে উদ্ধার করিতে পারিব না।”

পরদিন শাহ্নওয়াজ খাঁ, রাদন্দাজ খাঁ ও তাঁহার পত্নী, গুলরুখ, ফতেমা, নাজীর আহমদ খাঁ, হবীব, চৈতন্যদাস বৈরাগী, তর্করত্ন মহাশয় ও ভুবন জলপথে আগ্রায় যাত্রা করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

যমুনাভীরে আগ্রা দুর্গের সম্মুখে একজন গৌরবর্ণ যুবা পুরুষ একখানি নৌকার সম্মুখে বসিয়াছিল। তখনও যমুনা কিল্লা হইতে দূরে স্রব্ধিয়া যায় নাই, দুর্গের সম্মুখে একটিও বৃক্ষ জন্মায় নাই। ভীষণ রৌদ্র, বাদশাহ তখন আগ্রায় ; সুতরাং দুর্গের সম্মুখে ছত্র ব্যবহার করিবার উপায় নাই। যুবক মধ্যে মধ্যে ক্রমাল দিয়া রৌদ্র হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছিল, আবার তৎক্ষণাৎ দুর্গের দিকে চাহিয়া তাহা নামাইয়া লইতেছিল। শ্রাবণ মাস, বৃষ্টি নামিয়াছে, তথাপি রৌদ্রের তেজ অতীব

প্রথর। দুর্গ মধ্যে শুভ্র মর্ম্মরনির্ম্মিত অসংখ্য প্রাসাদশ্রেণীর অগণিত বাতায়নপথ স্ববর্ণধচিত্ত বহুবর্ণের যবনিকায় আবৃত। বাদশাহ তখন দুর্গমধ্যে, সেইজন্য হরিৎ বর্ণের পতাকা উড়িতেছে, দুর্গের চারিপার্শ্বে এক একজন সেনাপতি সহস্র হস্ত ব্যবধানে সেনানিবাস স্থাপন করিয়াছেন। সর্ব্বদা সূক্ষ্মজিত সৈন্যগণ দুর্গের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দুর্গমধ্যে যমুনাতীরে প্রাসাদের অন্তঃপুর, সে স্থানে তাতারী ও তুর্কী প্রতীহারীগণ ভীষণ রোদ্রে শূন্যমস্তকে দশহস্ত ব্যবধানে দাঁড়াইয়া আছে। দুই তিন জন প্রহরী আসিয়া যুবককে অপেক্ষা করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু যুবকের নিকটে বাদশাহী পঞ্জা দেখিয়া দূরে সরিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে দুই দণ্ড অতীত হইয়া গেল, যুবকের নিদ্রাকর্ষণ হইল। এই সময়ে দুর্গমধ্যে জহাঙ্গীরি মহলে সেতার বাজিতে আরম্ভ হইল। যুবক মনে করিল যে, বহুদূর বঙ্গদেশে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী-সঙ্গমে সে একখানি বৃহৎ বজ্রার কক্ষে গজদন্তনির্ম্মিত খট্টায় শয়ন করিয়া আছে, আর তাহার পার্শ্বে বসিয়া এক অনিন্দ্য স্তম্ভরী যুবতী সেতার সিদ্ধ ভূপালী বাজাইতেছে। ক্ষণকাল পরে যুবকের তন্দ্রার ঘোর ছাড়িয়া গেল; সে চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু তথাপি সেতারের আওয়াজ আসিতে লাগিল; যুবক চক্ষু মার্জ্জনা করিল। তখনও সিদ্ধ ভূপালী বাজিতেছিল। হঠাৎ জহাঙ্গীরি মহলের একটি গবাক্ষের যবনিকা সরিয়া গেল, তাহাতে তাতারী প্রতীহারী ও একটি যুবতীর মুখ দৃষ্ট হইল।

যুবক সেই দিকে চাহিল, মুহূর্তের জন্য রমণীষয়ের মুখমণ্ডল তাহার নয়নগোচর হইল। তাতারী নিমক্‌হারাম্‌ নহে, সে তৎক্ষণাৎ যবনিকা টানিয়া দিল, যুবকের মনে হইল যে দ্বিতীয়ার মুখ তাহার নিকট অপরিচিত নহে। গবাক্ষের যবনিকা সরিল না। ক্ষণকাল পরে দরিয়াই ফটক হইতে একজন খোজা ও একটি পরিচারিকার সহিত এক প্রৌড়া বাহির হইয়া আসিল। তাহাকে নৌকায় তুলিয়া লইয়া যুবক মাঝিদিগকে নৌকা ছাড়িয়া দিতে বলিল। আগ্রার কিল্লা দূরে সরিয়া গেলে, প্রৌড়া অবগুষ্ঠন মোচন করিয়া কহিল, “বাবা, আজি সংবাদ শুভ ; বাদশাহ বেগমকে রাজি করিয়া আসিয়াছি, তুমি কল্যা নবাব আসফ্‌ খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিও, তিনি তোমাকে দেওয়ান-ই-খাসে লইয়া যাউবেন।”

যুবক প্রফুল্লবদনে কহিল, “মা, এতদিনে বোধ হয় ভগবান্‌ মুখ তুলিয়া চাহিলেন।”

“আর এতদিনে বোধ হয় ললিতার দুঃখ ঘুচিল।”

“আসদ্‌ খাঁর কোন সংবাদ পাইলে?”

“না, তবে শুনলাম যে ফিদাই খাঁর নিকট হইতে খাজনা লইয়া দেওয়ান হরেকৃষ্ণ রায় আগ্রায় আসিতেছেন।”

“আসদ্‌ খাঁ না আসিলে বাদশাহের দরবারে স্তবিধা হইবে না।”

“দেখ বাবা, এইবার তুমি ললিতাকে বিবাহ কর।”

“বাদশাহী পুরোহিত পাইব কোথায়?”

“বাদশাহ বেগম বলিয়াছেন যে বৃন্দাবন হইতে একজন বাঙ্গালী গোস্বামী আনাইয়া দিবেন। তিনি ললিতাকে দেখিতে চাহিয়াছেন, আমি বলিয়াছি যে বিবাহের পরে লইয়া আসিব।”

যুবক উত্তর দিল না, তাহা দেখিয়া প্রৌঢ়ার নয়নদ্বয় আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নৌকা সহরের দিকে চলিয়া গেল। তখন জহাঙ্গীরি মহলে শুভ মর্শ্বরাচ্ছাদিত গৃহতলে বসিয়া পূর্ব পরিচিতা যুবতী তাতারীর সহিত পরামর্শ করিতেছিলেন। যুবতী জিজ্ঞাসা করিল, “যে স্ত্রীলোকটা নৌকায় গিয়া উঠিল, তাহাকে তুই চিনিস?” তাতারী কহিল “চিনি।” “ও কে?” “ও বাঙ্গালী, ভাল সূঁচের কাজ করিতে জানে, দুই দিন অন্তর হজরৎ বাদশাহ বেগমের নিকটে আসে।” “উহার নাম কি?” “সে আমি বলিতে পারিব না, হয় বিন্দিনী নয় বিন্দানী।” “বিনোদিনী কি?” “হাঁ, আপনি ঠিক কাফেরের মত কথা বলিতে পারেন।” “আমি যে, অনেক দিন বাঙ্গালা গুলুকে ছিলাম।” “উহাকে কি আপনি চেনেন?” “না, তোকে যা বলিতেছি শোন, নৌকার কাছে যে বসিয়াছিল সে আমার খসম। তুই তাহার সন্ধান করিতে পারিস?” “কেন পারিব না? ছুটি পাইলেই হয়, তবে কিছু খরচ আছে।” “যত টাকা লাগে দিব, তুই কি সহরের পথ ঘাট চিনিস?” “আমি চিনি না বটে, তবে সহরে আমার এক দোস্তু আছে”—তাতারী এই বলিয়া দ্রুত হাসিল—“সে আগ্রা সহরের প্রত্যেক লোককে

চেনে, কিন্তু বেগম সাহেব, তাহার একটু ঘন ঘন তৃষ্ণা পায়।”

“আমি খানসামানের উপরে হুকুমনামা দিতেছি, তুই তাহাকে ইরাণী ও ফিরিজি আরকে ডুবাইয়া রাখিস।”

তাতারী দীর্ঘ সেলাম করিয়া কহিল, “তাহা হইলে এক হস্তামধ্যে বেগম সাহেবের খসমের সন্ধান আনিয়া দিব।”

“তাহাকে ধরিয়া আনিতে হইবে।”

“কোথায় আনিব?”

“কেন, মহল্ সরার মধ্যে।” “তাহা হইলে ক্তাহারও মাথা থাকিবে না।” “কেন?” “শুনিয়াছি, হুজ্জাহাঁ বেগমের আমলে দুই এক জন মরদ্ আওরত্ সাজিয়া মহল্ সরার ভিতরে আসিত, কিন্তু হজ্জরৎ আরজ্-মন্দ বাহু বেগম সাহেবার আমলে তাহা হইবার উপায় নাই।”

“তবে আমি বেগম সাহেবার হুকুম লইয়া রাখিব।”

“দোহাই বেগম সাহেবা, এখন হজ্জরৎ বাদসাহ বেগমকে কিছু বলিও না, তাহা হইলে খসমের দেখা পাইবে না। বেগম সাহেব তোমার খসম্ পলাইয়াছে শুনিলে তাহাকে বাঁধিয়া আনিবার হুকুম দিবেন, সহরে গোল হইয়া যাইবে, কোর্টওয়ারের ফৌজ সাজিতে সাজিতে তোমার খসম্ সংবাদ পাইয়া পালাইবে। তুমি ব্যস্ত হইও না, আমি আগে সন্ধান লইয়া আসি।”

“সেই ভাল।”

“বেগম সাহেব, সব্বতের কিছু খরচা আর বখশিসের কিছু বায়না দিলে ভাল হয়।”

“কত দিব ?”

“দশটা কি পনেরটা আশ্রফি দিয়া ফেল না ?”

“পোড়ার মুখি, অতগুলো টাকা লইয়া কি করিবি ?”

“কেন, বেগম সাহেবকে দোয়া করিব, দুই দোস্তে সরাব খাইব, আর গর হাজির খসম্কে সোয়াবগাহে হাজির করিয়া দিব ?”

“পনের আশরফির সরাব খাইবি ?”

“বেগম সাহেব, এ তোমার কৰ্ম নয় ; এ আগ্রা সহর, কথায় বলে দারু-উল-মূলক আগ্রা। বেগম সাহেব, বাদশাহী কিল্লায় বসিয়া কুপণ হইলে চলিবে না, যদি খসম চাও মুঠা মুঠা আশরফি ছাড়।”

“তোমার যত টাকা লাগিবে দিব, কিন্তু তুই পনের আশরফী কি করিবি ?”

“দুইটা আশরফী দোস্তকে বায়না দিব, একটা আশরফী এক বেটা ফিরিজি গোলন্দাজকে ঘুসু দিয়া দশ কাফা আরক চোলাই করিয়া লইব, তাহাতে আন্দাজ দশ আশরফী খরচ হইবে। সহরের খরচের জন্য মোট দুইটা আশরফী রহিল।”

যুবতী তাতারীকে কাগজ কলম আনিতে বলিল। কাগজ আসিলে তাহাকে এক পত্র লিখিয়া দিল, মুখে বলিল, “জুম্মা মসজিদের পার্শ্বে আমার আমিন্ নাজীর আহম্মদ খাঁ আছে, তাহাকে এই রোকা দিলে তোকে পনের আশরফী দিবে।” তাতারী আশরফী লইয়া সেলাম করিল এবং কহিল, “এইবার

হজরৎ বাদশাহ্ বেগমের নিকট ছুটি পাইলেই হয়।” যুবতী জিজ্ঞাসা করিল, “কয় দিনের ছুটি চাই?”

“এক হফ্তা।”

“এক হফ্তা ত মদই খাইবি, তবে আমার খসম্ খুজিবি কখন?”

“বেগম সাহেব, কাল্মক্ তাতারের পেটে ফিরিঙ্গির আরক যতক্ষণ তাজা থাকিবে ততক্ষণ সে অসাধ্য সাধন করিবে, কিন্তু নেশা ছুটিলেই সর্বনাশ! আর নড়িতে চাহিবে না। আরক আর পায় না বলিয়াই যত তাতার ও তাতারী আফিম ধরিয়াছে।” “তুই কি কাল্মক্ না কি?” “না আমি যাকুং, আমার দোস্ত কাল্মক্।”

এই সময়ে চতুর্দশবর্ষীয়া পরম সুন্দরী একটি বালিকা জহাঙ্গীরি মহলে প্রবেশ করিয়া যুবতীকে কহিল, “গুল্‌ফুখ্, মা তোমাকে খুজিয়া বেড়াইতেছেন।” যুবতী ব্যস্ত হইয়া কহিল, “মাই বেগম সাহেব, হজরৎ বাদশাহ্ বেগম কোথায়?” বালিকা কহিল, “মা যোধবাই মহলে আছেন।” যুবতী তাতারীর সহিত দ্রুতপদে যোধবাই মহলের দিকে গমন করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

দেওয়ান-ই-আম

এই ঘটনার দুই তিন দিবস পরে একদিন প্রথম প্রহরের শেষে যামিনুদ্দৌলা নবাব আসফ্ খাঁ হস্তিপৃষ্ঠে দরবার আমে গমন করিতেছিলেন। আসফ্ খাঁ খুরজ্‌হা বেগমের ভ্রাতা, আরজ্‌ মন্দ্ বাগু বেগমের পিতা, বাদশাহ শাহজহানের স্বশুর, তিনি মোগল বাদশাহের দরবারে একজন প্রধান ব্যক্তি। তাঁহার নিজের অস্বারোহী ও পদাতিক সেনা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ঘাইতেছিল। হস্তীর পশ্চাতে এক শ্বেতবর্ণ সিন্ধুদেশীয় অশ্বপৃষ্ঠে জনৈক গৌরবর্ণ যুবক ধীরে ধীরে চলিতেছিল। হস্তী জুম্মা মসজিদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, নবাব হস্তী হইতে অবতরণ করিলেন। মসজিদের সম্মুখে আঞ্জা দুর্গের প্রধান তোরণ, তোরণের সম্মুখে এক জন পাঁচ হাজারি মনসবদারের শিবির, এই শিবিরের সম্মুখে বাদশাহ অথবা তাঁহার পুত্রগণ ব্যতীত অপর সকলকেই যান পরিত্যাগ করিতে হইত। আসফ্ খাঁ যুবকের সহিত ফটকের সম্মুখে আসিলেন, সেই স্থানে একজন তুরাণী মনসব্দার পাহারায় ছিল, সে বাদশাহের স্বশুরকে অভিবাদন করিয়া পথ ছাড়িয়া দিল। ফটকের উপরে নৌবৎ বাজিতেছিল, কারণ বাদশাহ

তখন দরবারে, তিনি যতক্ষণ দরবারে থাকিতেন ততক্ষণ আগ্রা দুর্গের দিল্লী ও অমরসিংহ ফটকে নৌবত বাজিত।

আসফ্ খাঁ ও যুবক দিল্লী ফটকে প্রবেশ করিয়া প্রথম চকের বাজারে উপস্থিত হইলেন। প্রতিদিন প্রভাতে এই স্থানে বাজার বসিত ও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ক্রয় বিক্রয় হইত, বহুমূল্য মণি মুক্তা ও দূর দূরান্তর হইতে আনীত মহার্ঘ দ্রব্যাদি এই স্থানে বিক্রীত হইত। আমীর ওমরাহ ব্যতীত অন্য কেহ এই বাজারে আসিতে পাইত না। যুবক বাজারের সৌষ্ঠব দেখিয়া বিস্মিত হইল। প্রথম চক পরিত্যাগ করিয়া আসফ্ খাঁ ও যুবক দ্বিতীয় চকে প্রবেশ করিলেন। চকের মধ্যে রক্তবর্ণ প্রস্তরনির্মিত পথ, উভয় পার্শ্বে মোগল, আফগান, ইরাণী, তাতার, রাজপুত অথবা ফিরিঙ্গি সেনা দলবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, মুক্ত তরবারি হস্তে মনস্‌বাদারগণ সৈন্তশ্রেণীর মধ্যে পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছে। আসফ্ খাঁকে দেখিয়া মনস্‌বাদারগণ দুই পদ হটিয়া অভিবাদন করিল; যাহারা উচ্চপদস্থ তাহারা অভিবাদনান্তে নিকটে আসিয়া বাদশাহের স্বপ্নের সহিত কথা কহিল। সুকলকেই যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া তিনি তৃতীয় চকে প্রবেশ করিলেন। চকের সম্মুখে অশ্বর ও যোদ্ধাপুরের রাজপুত সেনা অপেক্ষা করিতেছিল, দ্বিতীয় গ্রহরে নৌবৎ বাজিলে তাহারা দেওয়ান আম ও মহলসরার রক্ষণের ভার পাইবে।

তৃতীয় চকের দক্ষিণ দিকে শ্বেতমর্দরনির্মিত বিশাল মতি মসজিদ, বাম দিকে রক্তবর্ণপ্রস্তরনির্মিত আগ্রার টাক-

শালের সম্মুখে শুভ ও রক্তবর্ণ প্রস্তরনির্মিত গগনস্পর্শী নাকারাখানা, তাহার উপরে বাদশাহী নাকারা বাজিতেছে। নাকারাখানা তোরণের অভ্যন্তরে হস্তীর অরণ্য, অথ বাদশাহের সম্মুখে সহস্র হস্তীর সেলামী হইবে। নাকারাখানার গৃহতল ও দেওয়ান-ই-আমের সমস্ত পথ দুষ্কফেনিভ মর্শ্বরে আচ্ছাদিত, দরিদ্র তাহাতে পাদস্পর্শ করিতে কুণ্ঠিত হয়। নাকারাখানার সম্মুখে বহু পরিচারক দরবারিগণের পাছুকা রক্ষা করিতেছে। এই স্থানের পরেই বাদশাহ ও তাঁহার পুত্রগণ ব্যতীত আর কেহ পাছুকা লইয়া যাইতে পারেন না। দশহাজারি মনসব্দার যামিন্ উদ্দৌলা আসফ্ খাকে, সামান্য ওমরাহের ত্রায় নাকারাখানায় পাছুকা পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া, যুবক বিস্মিত হইল।

নাকারাখানার সম্মুখে খাস চৌকির মনসব্দার আসফ্ খাঁর পুত্র সায়েরুস্তা খাঁ দাঁড়াইয়াছিল। পুত্র পিতাকে অভিবাদন করিলেন, পিতা পুত্রকে প্রত্যভিবাদন করিয়া অগ্রসর হইলেন। সেই মুহূর্ত্তে সহস্র হস্তী শুণ্ডোত্তোলন করিয়া বাদশাহকে অভিবাদন করিল। যুবক স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। নাকারাখানার সম্মুখে রক্তবর্ণপ্রস্তরনির্মিত প্রকাণ্ড চক, চকের চারিদিকে ক্ষুদ্র বারান্দা, প্রতিদিকের বারান্দায় সহস্র হস্ত অস্তরালে এক একটা বারদুয়ারী, ইহা মনসব্দারদিগের কাছারী। বাদশাহের নিকটে যে সমস্ত মনসব্দার উপস্থিত থাকিতেন, তাঁহাদিগের সেনা দুর্গের বাহিরে থাকিত, কিন্তু তাঁহাদিগকে সমস্ত দিন দেওয়ান আমের চকে অপেক্ষা করিতে

হইত। চকের বারান্দায় এক একটি খিলাস এক এক জন মনসব্দার পাইতেন এবং সমস্ত দিন এই স্থানে অমুচরবর্গের সহিত উপস্থিত থাকিতেন। পাঁচ হাজারি মনসব্দারের নিম্নপদস্থ ব্যক্তি আগ্রা বা দিল্লী দুর্গের পাহারার অধিকার পাইতেন না। ছয় হাজারি, সাত হাজারি ও দশ হাজারি মনসব্দারগণ বাঁরদুয়ারিতে স্থান পাইতেন।

সহস্র হস্তী বাদশাহকে অভিবাদন করিয়া অমরসিংহ ফটক দিয়া নির্গত হইল, তখন নাকারাখানার তোরণ দিয়া সহস্র উষ্ট্র প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। সেই অবসরে আসফ্ খাঁ যুবকের সহিত অগ্রসর হইলেন। চকের মধ্যস্থলে তাত্ত্বের রেলিং, তাহার একদিকে রক্তপ্রস্তরনির্মিত দেওয়ান আম ও অপর দিকে নাগরিকদিগের স্থান। তাত্ত্বের রেলিং এর সম্মুখে পঞ্চাশত হস্ত প্রশস্ত স্থান, তাহার একদিকে অশ্বারোহী ও অপর দিকে পদাতিক সেনা দাঁড়াইয়া আছে। খাস চৌকির মনসব্দার প্রতিদিন দিবসের প্রথম দুই প্রহর পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী ও পঞ্চ সহস্র পদাতিক লইয়া দিল্লীস্থরের প্রকাণ্ড দরবারে শাস্তিরক্ষা করিতেন। দুর্গের বাহিরে পঞ্চাশত সহস্র অশ্বারোহী ও লক্ষ পদাতিক নিত্য সজ্জিত থাকিত। তাত্ত্বের রেলিংএর অপর পার্শ্বে বাদশাহের শরীররক্ষী সহস্র আহদী স্ত্রী পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। দরবার আমের সিংহাসনের সম্মুখে প্রশস্ত পথ, তাহার উভয় পার্শ্বে নিম্নশ্রেণীর ওমরাহ ও মনসব্দারগণ দাঁড়াইয়া আছেন।

আহদীসেনার নায়ক আসফ্ খাঁকে অভিবাদন করিয়া যুবকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আসফ্ খাঁর কথা শেষ হইলে তিনি পুনরায় অভিবাদন করিলেন, আসফ্ খাঁ অগ্রসর হইলেন। দেওয়ান-ই-আমের সম্মুখে তিনি, সোপান, সোপানের নিম্নে দাঁড়াইয়া আসফ্ খাঁ তিনবার ভূমি স্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিলেন। সোপানের উপরে ছাদবিহীন চত্বর, সেই স্থানে ভিন্ন ভিন্ন স্ববাদের জমিদার ও ক্ষুদ্র রাজ্যবর্গ অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া সহস্র আহদী সেনা পাহারা দিতেছিল, তাহাদিগের নায়ককে পরিচয় দিয়া আসফ্ খাঁ দেওয়ান আমের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। পুনরায় তিনবার অভিবাদন করিয়া আসফ্ খাঁ দেওয়ান-ই-আমে প্রবেশ করিলেন। দেওয়ান-ই-আমে তিনি স্তর আছে, প্রথম স্তরে দশ হাজারি মন্সবদার ও স্ববাদেরগণের স্থান, ইহা রক্তনির্মিত রেলিংএর দ্বারা বেষ্টিত। দ্বিতীয় স্তরে প্রধান প্রধান হিন্দুরাজগণের, উজীর বখ্শী শিপাহশালার খানসামান, সদর-উস্-সহর, কাজী উল্ কুদ্দুস ও প্রধানস্ববাদেরগণের স্থান, ইহা স্বর্ণনির্মিত রেলিংএর দ্বারা বেষ্টিত। তৃতীয় স্তরে বাদশাহের পুত্র, জামাতা ও আত্মীয়গণের স্থান, ইহার চতুর্দিকে আশা, সোটা, দুর্কাস, মহীমরাতবধারিগণ দাঁড়াইয়া আছে। যুবককে দেওয়ান-ই-আমের বাহিরে রাখিয়া আসফ্ খাঁ দরবারগৃহে প্রবেশ করিলেন। নকীব হাঁকিল, আরজবেগী তাঁহার নাম উচ্চারণ

করিলেন। আসফ্ খাঁ স্ববর্ণের রেলিংয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনবার অভিবাদন করিলেন, বাদশাহ সিংহাসনে বসিয়া প্রত্যভিবাদন করিলেন। আসফ্ খাঁ সিংহাসনের নিম্নে গিয়া দাঁড়াইলেন।

সহস্র উষ্ট্র এবং সহস্র সুসজ্জিত অশ্ব বাদশাহকে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। তখন খাস চৌকীর মনসবদারের সেনা বাদশাহের সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন করিয়া স্বস্থানে প্রত্যা-বর্তন করিল। দুর্গের বাহির হইতে দলে দলে অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনা নাকারাখানার পথে প্রবেশ করিয়া বাদশাহকে অভিবাদন করিতে আসিল। পঞ্চাশৎ সহস্র অশ্বারোহী ও লক্ষ পদাতিক আসিতে যাইতে দুই দণ্ড সময় লাগিল। এই অবসরে বাদশাহ আর্জী শুনিতে লাগিলেন। সমস্ত সৈন্তের অভিবাদন শেষ হইলে নাকারা খামিল, তখন আসফ্ খাঁ অক্ষুটস্বরে বাদশাহকে কি বলিলেন। বাদশাহ সম্মতি দিলেন, একজন চোপদার যুবককে রজতের রেলিংয়ের সম্মুখে আনিল। যুবক আসফ্ খাঁর গায় অভিবাদন করিল।

বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, “সাহেব, এই যুবা কে?” আসফ্ খাঁ অভিবাদন করিয়া কহিলেন, “ইহার নাম ময়ুখ, ইহার পিতা দেবেন্দ্রনারায়ণ সুবা বাঙ্গালার একজন জমিদার ছিল, জিন্নৎমকানী নূরউদ্দীন জহাঙ্গীর বাদশাহের সময় ইহার পিতা তখ্তের বহুৎ খিদমৎ করিয়াছে।”

বাদশাহ হাসিয়া কহিলেন, “স্মরণ আছে, আমি যখন

বিক্রোহী হইয়াছিলাম তখন উড়িয়া ও আকবরাবাদে ইহার পিতা আমার সহিত লড়াই করিয়াছিল।”

“শাহান শাহ্ বাদশাহের ছকুমে দেবেন্দ্রনারায়ণ শাহ-জাদা খুরমের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, ভরসা করি শাহার-উদ্দীন মহম্মদ শাহ্-জহান্ বাদশাহ লাজী সাহিব কিরাণ-মানি সে অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।”

এই সময়ে তৃতীয় স্তরে ইফ্‌তিকার্-উল্-মুলক্ আসদ্ খাঁ ও দ্বিতীয় স্তরে মনিরুদ্দৌলা শাহ্-নওয়াজ খাঁ অভিবাদন করিলেন। দেওয়ান-ই-আমের রীতি অনুসারে নকীব হাঁকিল, “রৌশন্-উল্-মুলক্ মনিরুদ্দৌলা শাহ্-নওয়াজ খাঁ হয়বৎ জঙ্গ হজরৎ জলালী।” বাদশাহ শাহ্-নওয়াজ খাঁর দিকে চাহিলেন, বৃদ্ধ নবাব পুনরায় অভিবাদন করিয়া কহিলেন, “শাহান্ শাহ্, কাফের ফিরিজি যখন বাদশাহী বন্দর সপ্তগ্রাম আক্রমণ করিয়াছিল তখন এই কাফের যুবা সপ্তগ্রাম রক্ষা করিয়াছিল।” বাদশাহ আসদ্ খাঁর দিকে চাহিলেন, নকীব হাঁকিল, “ইফ্‌তি-কার্-উল্-মুলক্ সৈফ্‌উদ্দৌলা আমীর-উল্-বহর আসদ্ খাঁ শমসের জহাজীরী।” আসদ্ খাঁ অভিবাদন করিয়া বলিলেন, “জহাপনা, স্খান্দার মোকরম্‌খাঁর আমলে সপ্তগ্রামে ফিরিজির সহিত যে লড়াই হইয়াছিল বন্দা সে সংবাদ পূর্বেই নিবেদন করিয়াছে। ফিরিজির গোলার ভয়ে ফৌজদার কলিমুল্লা খাঁ পলায়ন করিলে, এই যুবা সপ্তগ্রামের এক বণিকের সেনা লইয়া বাদশাহী বন্দর রক্ষা করিয়াছিল।”

বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, “স্বরাটের ফিরিজিদিগের দূত আসিয়াছে।”

উজীর কহিলেন, “জনাব আলী, আংরেজ ফিরিজির দূত নাকারাকানায় হাজির আছে, হুকুম হইলে দেওয়ান আমে উপস্থিত হইবে।”

“নবাব শাইনওয়াজ খাঁ, আসদ্ খাঁ ও ফিরিজি দূত গোসলখানায় আসিবেন। নবাব সাহেবের সহিত যে কাফের ফকীর আসিয়াছিল সে কি ফিরিয়া গিয়াছে?”

“শাহান্ শাহ্ বাদশাহের হুকুম অনুসারে সে কাফের মথুরায় আছে।”

“তাহাকে তলব কর। আসদ্ খাঁ, নবাব সাহেব, রামিন-উদ্দৌলা ও দেবেন্দ্রনারায়ণের পুত্র দেওয়ান-ই-খাসে উপস্থিত হইবেন।”

বাদশাহ্ তৎ পরিত্যাগ করিলেন, নাকারা বাজিয়া উঠিল, দরবার শেষ হইল। ✓

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

মথুরার পুরোহিত

সেই দিন তৃতীয় প্রহরে ময়ূখ বর্মান্ত কলেবরে সিকন্দর-পুর মহল্লার একটি ক্ষুদ্র গৃহের দ্বারে করাঘাত করিলেন।

ভিতর হইতে বামাকণ্ঠে প্রশ্ন হইল “কে?” “আমি, দুয়ার খোল।”

পুনরায় বাঁকুলায় প্রশ্ন হইল “তুমি কে?” “আমি ময়ূখ, ভয় নাই, দুয়ার খোল।”

এই বার দুয়ার খুলিল, ময়ূখ গৃহে প্রবেশ করিলেন দ্বারের পার্শ্বে বিনোদিনী দাঁড়াইয়াছিল, সে জিজ্ঞাসা করিল, “বাবা, কি হইল?”

“দেওয়ান-ই-আমে গিয়াছিলান, বাদশাহ্ দেওয়ান ই-খামে যাইতে হুকুম করিয়াছেন, অদ্য সন্ধ্যাকালে যাইব।” “আমি গোবিন্দজীর পূজা তুলিয়া রাখিয়াছি। বাবা, বাদশাহ্ বেগমের বাদী আসিয়াছিল, আজি সন্ধ্যাকালে বৃন্দাবন হইতে বাঁকুলা পুরোহিত আসিবেন। কালি অধিবাস, পরশু বিবাহ।”

ললিতা দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দরবারের কথা শুনিতে-ছিলেন, বিবাহের নাম শুনিয়া ছুটিয়া পলাইলেন। ময়ূখ হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া বসিলেন, তখন বিনোদিনী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাবা, কি বুঝিতেছ?” ময়ূখ বলিলেন, “মা, অদৃষ্ট বোধ হয় ফিরিতেছে, এত দিন আসদুখার সন্ধান করিয়া মরিলাম, আজি দেখি আসদুখা দেওয়ান-ই-আমে উপস্থিত।”

“কালি দেওয়ান হরেকৃষ্ণ রায় আসিবেন।”

ময়ূখ গৃহে প্রবেশ করিলে, একজন দীর্ঘাকার কাল্মকু তাতার ও অবগুণ্ঠনাবৃত্তা এক মুসলমানী গৃহদ্বারে আসিয়া

দাঁড়াইল। কাল্মকু দূরে রহিল, রমণী গৃহদ্বারে কান লাগাইয়া কথোপকথন শুনিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণপরে কাল্মকু জিজ্ঞাসা করিল, “কি শুনিলি?”

“বাক্সালা মূলকের বুলি, কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।”

“মরদটার নাম কি?”

“আ মর, তাইত খুঁজিতেছি, সরাবের শিশিটা দে।”

“আর সরাব খাইলে টলিয়া পড়িয়া যাইবি, তখন কোতয়ালীতে ধরিয়া লইয়া যাইবে।”

রাজধানীর জনাকীর্ণ পথে বহুলোক চলিতেছিল, ক্ষুদ্র গৃহদ্বারে দীর্ঘাকার সশস্ত্র কাল্মকুকে দেখিয়া কেহ কেহ বিস্মিত হইল; কিন্তু তাহার সহিত রমণীকে দেখিয়া কোনও সন্দেহ করিল না। সেই সময়ে বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিল, “ময়ূখ, তুমি কখন দেওয়ান-ই-খাসে যাইবে?” ময়ূখ কহিলেন, “সন্ধ্যার পরে।”

তাহা শুনিয়া ছ্যারের বাহিরে রমণী বলিয়া উঠিল, “দোস্তু, শীঘ্র শিশিটা দে।” কাল্মকু জিজ্ঞাসা করিল, “কেন?”

“মোগল বাদশাহের অন্দর মহলের চাকরী, আর বাক্সালা মূলকের জবান, আর মরুভূমি এই তিনই সমান।”

“কিছু বুঝিলি না কি?”

“নামটা শুনিয়াছি।” “কি?” “মহকু।” “ঠিক শুনিয়াছিস্ ত?” “ঠিক শুনিয়াছি, তুই শিশিটা দে।” “এখানে দাঁড়াইয়া আর কাজ নাই, তুই পথে চলিয়া আয়।”

কালমক্ ও তাতারী গৃহদ্বার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। সন্ধ্যার সময়ে ময়ূখ গৃহত্যাগ করিলেন, কালমক্ দূরে লুকাইয়া থাকিয়া তাহা দেখিল এবং দূরে থাকিয়া তাহার অনুসরণ করিল। দুই দণ্ড পরে কালমক্ ফিরিয়া আসিয়া গৃহদ্বারে করাঘাত করিল। ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কে?” কালমক্ কহিল, “হামি।”

বিনোদিনী প্রশ্ন করিতেছিল, কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহার সন্দেহ হইল, সে দ্বারের নিকটে আসিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, “কে গা?”

কালমক্ পুনরায় কহিল, “হামি।”

বিনোদিনী এইবার রাগিল; “তুই কেরে মিন্‌সে?” কালমক্ সাহসে ভর করিয়া কহিল, “হামি মছক্।”

বিনোদিনী পা টিপিয়া টিপিয়া ফিরিয়া গেল এবং ললিতাকে কহিল, “দেখ ললিতা, এক মিন্‌সে চোর আসিয়াছে, তুই এক হাঁড়ি পচা গোবর লইয়া ছাদে যা, আমি যখন দ্বার খুলিব সেই সময়ে মিন্‌সের মাথায় ঢালিয়া দিবি।”

ললিতা গোবরের হাঁড়ি লইয়া ছাদে চলিয়া গেলেন। তখন বিনোদিনী গোশালার পুরাতন সন্মার্জ্জনী সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দ্বার খুলিয়া ফেলিল। সেই সময়ে ললিতা বহুদিনের সঞ্চিত কুমিময় দুর্গন্ধ গোময়রাশি কালমকের মস্তকে বর্ষণ করিল। তাহার চক্ষু, মুখ ও নাসিকা বদ্ধ হইয়া গেল, আর বিনোদিনীর সন্মার্জ্জনী ভীষণবেগে তাহার

পৃষ্ঠদেশে পতিত হইল। কাল্মক্ রণে ভঙ্গ দিয়া উর্দ্ধাঙ্গে পলায়ন করিল।

ময়ূখের গৃহের কিঞ্চিৎ দূরে কাল্মকের সঙ্গিনী অপেক্ষা কুরিতেছিল; কাল্মক্ তাহার নিকটে যাইবামাত্র রমণী পুতি-গন্ধময় গোময়ের গন্ধে অস্থির হইয়া উঠিল এবং নাকে ক্রমাল দিয়া কহিল, “পঁচা গন্ধ লইয়া আসিলি কোথা হইতে? গোর-স্থানে গিয়াছিলি না কি?” কাল্মক্ নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে করিতে কহিল, “বাঙ্গালী বিবি আশিক্ করিয়াছে, বাঙ্গালা মূলকের আহল কসমের ইত্তর ঢালিয়া দিয়াছে।”

গন্ধ সন্ধ্য করিতে না পারিয়া রমণী দূরে সরিয়া দাঁড়াইল এবং কহিল, “তুই তোর বাঙ্গালী বিবির নিকটে ফিরিয়া যা—আমার নিকট আসিলে জুতা খাইবি।”

কাল্মক্ ক্রমাল দিয়া গোবর মুছিতে মুছিতে কহিল, “তাই ত দোস্ত, এমন মওকাটা মাটি হইয়া গেল। আমি ভাবিয়াছিলাম যে দুয়ার খুলিলেই ঘরে ঢুকিয়া আউরৎ দুইটাকে বাঁধিয়া ফেলিব, রাজিতে মরদুটা যখন ফিরিয়া আসিবে তখন তাহাকে ধরিয়া লইয়া অনায়াসে যেখানে খুসী লইয়া যাইব। এখন করি কি?”

এই সময়ে একজন আহদী মহলসরার একজন পরিচারিকা ও জর্নৈক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ময়ূখের গৃহদ্বারে গিয়া দাঁড়াইল। আহদী গৃহদ্বারে করাঘাত করিল, গৃহমধ্যে বিনোদিনী প্রস্তুত হইয়াই ছিল, সে বলিল, “আবার আসিয়াছিস?”

আহদী হিন্দু রাজপুত ; সে হিন্দীতে বলিল, “মাইজী, আমি হজরৎ বাদশাহ্ বেগমের নিকট হইতে আসিতোঁছ, বৃন্দাবন হইতে পুরোহিত আসিয়াছেন।”

ভিতর হইতে বিনোদিনী কহিল, “তুমি যেই হও এখন দাঁড়াও, আমার বেটা বাহিরে গিয়াছে, না আসিলে দুয়ার খুলিব না।”

পুরোহিত রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া বলিলেন, “মা, তোমার কোন ভয় নাই, আমি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ; রাত্রি অধিক হইয়াছে, দুয়ার খুলিয়া দাও।” বাদশাহ্ বেগমের দাসীও ভরসা দিল, তখন বিনোদিনী দুয়ার খুলিল।

গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া আহদী জিজ্ঞাসা করিল, “মাইজী, তোমার বেটা কোথায় গিয়াছে ?” বিনোদিনী কহিল, “দেওয়ান-ই-খাসে।”

কাল্মকু তাহাদের নিকটে অঙ্ককারে লুকাইয়া ছিল। সে এই কথা শুনিয়া সেই স্থান হইতে সরিয়া পড়িল। দূরে বৃক্ষ তলে তাহার সঙ্গিনী লুকাইয়াছিল, সে তাহার নিকটে গিয়া বলিল, “কাজ হাসিল করিয়াছি।”

রমণী জিজ্ঞাসা করিল, “কি হইয়াছে ?” “আর কতটা সরাব আছে ?” “দুই শিশি।” “একটা শিশি আমাকে দে।” “কেন আগে বল।” “কাজ হাসিল করিয়াছি।” “কি কাজ তাহা বলনা।” “মরদটার পাত্তা পাইয়াছি।” “কি পাত্তা

পাইয়াছি?” “সে খাস দরবারে গিয়াছে।” “তবে আর বিলম্ব করিয়া কাজ নাই, তুই আর সরাব থাইলে চলিতে পারিবি না। এই বেলা চল, অমরসিংহ ফটকে লুকাইয়া থাকিব।”

তখন গৃহের মধ্যে বিনোদিনী মথুরার পুরোহিতের অভ্যর্থনা করিতেছিলেন। বিনোদিনী আসন দিলেন, পুরোহিত উপবেশন করিলেন। সেই মুহূর্তে ললিতা পাগলিনীর গ্রায় ছুটিয়া আসিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পদতলে লুটাইয়া পড়িল। সে একবার মাত্র ডাকিল, “তর্করত্ন খুড়া?” তাহার পরে মূচ্ছিতা হইয়া পড়িল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

দেওয়ান-ই-খাস

✓ বাদশাহ্, যখন আগ্রায় থাকিতেন তখন প্রতিদিন আগ্রা দুর্গ ও প্রাসাদ সমূহ বহু বর্ণের আলোকমালায় সজ্জিত হইত, লক্ষ লক্ষ গন্ধ তৈলের দীপ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের কাচের আবরণের মধ্যে রক্ষিত হইত, শ্বেত মর্ম্মরের জলাশয়ে শত শত ফোয়ারার মুখে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের স্নগন্ধি বারিরাশি উদ্ভিত হইত, ফোয়ারার চারি পার্শ্বে ও মর্ম্মরনির্ম্মিত হ্রদের চারি দিকে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

দীপাধার সজ্জিত থাকিত, তাহাতে অসংখ্য প্রদীপ জলিয়া উজ্জল আলোকে জলরাশি উদ্ভাসিত করিত। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে ময়ূখ যখন আগ্রা দুর্গে প্রবেশ করিলেন, তখন আগ্রার দুর্গ সহস্র সহস্র দীপমালায় উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। দুর্গদ্বারে আসফ্ খাঁর একজন অনুচর তাহার জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল। তিনি আসিলে সে ব্যক্তি তাঁহাকে লইয়া দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিল। আসফ্ খাঁর মোহরাস্কিত পত্র দেখিয়া প্রহরিগণ পথ ছাড়িয়া দিল।

তখন প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় চক জনশৃংখ, মতি মসজিদ, টাঁকশাল, ও নাকারাখানা জনশৃংখ, দেওয়ান-ই-আমের প্রকাণ্ড চত্তর জনশূন্য। চত্তরের চারিদিকে মনসবদারদিগের কাছারিতে অনেকগুলি আলোক জলিতেছে, দুই একজন মনসবদার বখ্শীর আদেশের অপেক্ষায় তখনও প্রতীক্ষা করিতেছে। ময়ূখ ও তাঁহার সঙ্গী নাকারাখানা হইতে পশ্চিম দিকে গমন করিয়া দেওয়ান-ই-আমের বামদিকে একটি ক্ষুদ্র দ্বারে প্রবেশ করিলেন। সেই দ্বারের পশ্চাতে উলঙ্গ রূপাণ হস্তে একজন হাবসী খোজা পাহারা দিতেছিল, আসফ্ খাঁর অনুচর তাহাকে উজীরের মোহরাস্কিত পত্র দেখাইল, খোজা পথ ছাড়িয়া দিল। দ্বারের পশ্চাতে সোপানশ্রেণী ছিল, তাহা অবলম্বন করিয়া ময়ূখ উপরে উঠিলেন। সম্মুখে রক্তবর্ণপ্রস্তর-নির্মিত দ্বিতল গৃহ, তাহাতে অসংখ্য চোপদার, হরকরা, খোজা ও পরিচারক অপেক্ষা করিতেছিল। ময়ূখ ও তাঁহার সঙ্গী সে

মহল পার হইয়া দেওয়ান-ই-খাসের চত্বরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ দ্বারে খাস্ চৌকীর দারোগা সায়েস্তা খাঁ অপেক্ষা করিতেছিলেন, ময়ুথকে তাঁহার নিকট পৌছাইয়া দিয়া তাঁহার সঙ্গী চলিয়া গেল।

সায়ের্তা খাঁ ময়ুথের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া একজন খোজাকে ইঙ্গিত করিলেন। খোজা ময়ুথকে লইয়া দেওয়ান-ই-খাসের চত্বরে প্রবেশ করিল। আগ্রাহুর্গের পালি ফটকের পশ্চাতে শ্বেতমর্ম্মরনির্মিত প্রশস্ত ছাদ, তাহার একদিকে একখানি কৃষ্ণমর্ম্মরনির্মিত ও অপরদিকে শুভ্রমর্ম্মর-নির্মিত এক একখানি স্থাসন। ছাদের উত্তরদিকে দেওয়ান-ই-খাস, শ্বেতমর্ম্মরনির্মিত ক্ষুদ্র গৃহ। এই ক্ষুদ্র গৃহের প্রাচীরে যত বহুমূল্য প্রস্তর ও মণিমুক্তা চিত্রাঙ্কনের জগ্ন সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল, লোকে বলিত যে তাহা ব্যয় করিলে আর একটা আগ্রা সহর নির্মিত হইতে পারে। বাদশাহ্ তখনও আসেন নাই, দেওয়ান-ই-খাসের সম্মুখে উজীর আসফ খাঁ মীরবখ্শী নূরউল্লাখার সহিত পরামর্শ করিতেছিলেন। ময়ুথ আসফ খাঁকে অভিবাদন করিয়া প্রাচীরের চিত্র পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

পান্নার ময়ূর, চুনি ও পোখ্‌রাজ-খচিত বিচিত্র পুচ্ছ বিস্তার করিয়া মুক্তার আঙ্গুর গুচ্ছে চঞ্চু দিয়া আঘাত করিতেছে। সে চিত্র এখন আর নাই, বহুপূর্বে জাঠ দস্যু স্বরজ-মল তাহা লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে। ময়ুথ চিত্র দেখিতে-

ছেন, এমন সময়ে এক ব্যক্তি তাঁহার স্বক্ষে হস্তার্পণ করিল। ময়ূখ ফিরিয়া দেখিলেন যে তাঁহার পার্শ্বে আসদ্ খাঁ দাঁড়াইয়া আছেন। ময়ূখ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিলেন, আসদ্ খাঁ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, “ময়ূখ, তুমি দেবেল্ল-নারায়ণের পুত্র, আমার জীবনদাতা, বহুদিন পরে তোমার দর্শন পাইয়া আজ বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি। ✓ তুমি এখন কি করিবে?”

“বাদশাহের অধীনে চাকরী পাইলে গ্রহণ করিব।”

“এতদিন কোথায় ছিলে?”

ময়ূখ সপ্তগ্রামের যুদ্ধের পরে তাহার যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা যতদূর জানিতেন বলিলেন, তখন আসদ্ খাঁ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “ময়ূখ, তুমি কত দিন আগ্রায় আসিয়াছ?”

“প্রায় তিন বৎসর হইল।”

“এতদিন কি করিতেছিলে?”

“জীবিকা অৰ্জ্জনের উপায় অন্বেষণ করিতেছিলাম। বাদশাহ দরবারে কোনও পরিচিত ব্যক্তি ছিল না বলিয়া এতদিন কিছু সুবিধা করিতে পারি নাই।”

“আজি কি উপায়ে আসিলে?”

“সেই বৈষ্ণবী হজ্জরৎ বাদশাহ বেগমকে স্তূচের কাজ শিখাইতে যায়, তিনি নবাব আসদ্ খাঁকে পত্র দিয়াছিলেন, সেই জন্ত উজীর স্বয়ং আমাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন।”

“অতু খোদা ফিরিজি হার্মাদের বিনাশের উপায় জুটা-
ইয়া দিয়াছেন, নূতন ফিরিজি দিয়া পুরাতন ফিরিজি বিনাশ
করিব।”

ময়ুখ বিস্মিত হইয়া আসদ্ খাঁর মুখের দিকে চাহিলেন।
সহসা নাকরাখানায় নাকারা বাজিয়া উঠিল, আসদ্ খাঁ ফিরিয়া
দাঁড়াইলেন। ময়ুখ দেখিলেন যে, দেওয়ান-ই-খাসের পশ্চাতে
একটি স্বর্ণনির্মিত কবাট খুলিয়া গিয়াছে, বাদশাহ্ ক্ষুদ্র হস্তি-
দন্তনির্মিত তঞ্জামে আরোহণ করিয়া প্রবেশ করিতেছেন। সম-
বেত সভাসদগণ তিন বার ভূমি স্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিল,
তাহা দেখিয়া ময়ুখও তদ্রূপ করিলেন। বাদশাহ্ উপবেশন করিলে
উজীর আসফ্ খাঁ, বখশী নূরউল্লা খাঁ, আসদ্ খাঁ, শাহ্নওয়াজ
খাঁ, প্রভৃতি সভাসদগণ সিংহাসন বেঠেন করিয়া দাঁড়াইলেন।
আসফ্ খাঁ সর্ব প্রথমে ময়ুখকে বাদশাহের সম্মুখে উপস্থিত
করিলেন। বাদশাহ্ শাহ্ জহান প্রশ্নবদনে কহিলেন, “বান্ধালী
বাহাদুর, তোমার কথা বিশ্বত হই নাই, কিন্তু তোমার অগ্রে
ফিরিজি।” আসফ্ খাঁ যিবল্ল বদনে কহিলেন, “জনাব,
এই যুবা আগ্রা সহরে তিন বৎসর বেকার বসিয়া আছে,
ইহার পিতা জিন্নৎমকানী বাদশাহ্ জহাঙ্গীরের জমানায়
সরকারের বলৎ খিদমৎ করিয়াছে—”

“সাহেব, অতুই ইহার ব্যবস্থা করিব। ফিরিজি দূত
কোথায়?”

“উপস্থিত আছে।”

অলক্ষণ পরে সায়েস্তা খাঁ জনৈক বয়স্ক ফিরিজিকে লইয়া দেওয়ান-ই-খাসে প্রবেশ করিলেন। ফিরিজি ভূমি চূষন করিয়া বাদশাহকে অভিবাদন করিল। উজীর আসফ্ খাঁ জিজ্ঞাসা করিলেন, “ফিরিজি, তোমার নাম কি?”

ফিরিজি পুনরায় অভিবাদন করিয়া কহিল,—“আমার নাম ওয়াইল্ড, আমি স্বরট বন্দরে ইংরাজ কোম্পানীর প্রধান।”

“তোমরা কি পৰ্তুগীজ ফিরিজির দুঃমন্?”

“হঁ।”

“তোমরা ঈসাই?”

“হঁ, তবে পৰ্তুগীজদের শ্রায় নহে।”

“যদি শাহানশাহ্ বাদশাহের হুকুম তামিল করিতে পার, তাহা হইলে তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।”

বাদশাহ্ জিজ্ঞাসা করিলেন, “আসদ্ খাঁ, তোমার সহিত সপ্তগ্রামে ফিরিজির বিবাদ হইয়াছিল কেন?”

“জহাপনা, এক কাফের পাদ্রীর নিকট হইতে পলাইয়া বাদশাহী বন্দরে আশ্রয় লইয়াছিল, পাদ্রী ফিরিজি সিপাহী লইয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিয়াছিল, আমি বাধা দিয়াছিলাম বলিয়া সে আমাকেও আক্রমণ করিয়াছিল। সেই দিন দেবেন্দ্রনারায়ণের পুত্র আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিল। কাফেরকে ধরিয়া লইয়া যাইতে পারে নাই বলিয়া ফিরিজি ফোজ রাত্রিকালে বন্দর আক্রমণ করিয়া লুট করিয়াছিল। তখনও এই যুবা সপ্তগ্রাম রক্ষা করিয়াছিল।” ✓

“আপনি সেই রাত্রিতে ফিরিজির সহিত লড়াই করিয়া-
ছিলেন?”

“হাঁ, নবাব শাহনওয়াজ খাঁও সেই রাত্রিতে উপস্থিত
ছিলেন।”

শাহনওয়াজ খাঁ অগ্রসর হইয়া আসিলেন, আসফ্ খাঁ
জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি ফিরিজিদের হাঙ্গামার দিনে
সপ্তগ্রামে ছিলেন?”

“হাঁ, আমি ও আমার পুত্রবধূ সেই রাত্রিতে ফিরিজি-
দিগের হস্তে বন্দী হইয়াছিলাম। সপ্তগ্রামের শেঠ গোকুল-
বিহারীর আক্রমণে ফিরিজি হারিয়া পলাইয়া গিয়াছিল; পরদিন
সপ্তগ্রামের নিম্নে ফিরিজিরা আমার বজরা মারিয়া আমাকে ও
আমার পুত্রবধূকে ও আমার পালিতা কন্যাকে হুগলীতে
ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। ফিরিজি আমীর-উল-বহর ডিম্ভুজা দয়া
করিয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছে।”

✓ আসফ্ খাঁ ফিরিজি দূতকে কহিলেন, “আপনি শুনিলেন?”
“শুনলাম।”

সহসা আসদ্ খাঁ বাদশাহের নিকটে আসিয়া অভিবাদন
করিয়া কহিলেন, “শাহন্ শাহ্ বাদশাহের অল্পমতি হইলে
মাস কিঞ্চিং নিবেদন করিতে চাহে।”

বাদশাহ্ মন্তক সঞ্চালন করিয়া অল্পমতি দিলেন, তখন
আসদ্ খাঁ বৃদ্ধ উজীর আসফ্ খাঁকে কহিলেন, “জনাব,
ইংরাজ বণিকের দূত সমস্ত কথা শুনে নাই, নবাব শাহ্-

নওয়াজ খাঁ হিন্দুস্থানের একজন প্রসিদ্ধ ওমরাহ, আমি বাদশাহের অমুচর; সামান্য ফিরিজি বণিক যখন আমাদের উপর এমন অত্যাচার করিতে পারে, তখন স্বে বাঙ্গালার শত শত দরিদ্র প্রজা তাহাদিগের নিকট কি ব্যবহার পায় তাহা বিচারযোগ্য। আমার দুইজন সাক্ষী আছে।”

বাদশাহ্ এতক্ষণ নীরব ছিলেন, তিনি সহসা আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার মস্তক হইতে মণি-মুক্তাখচিত বহুমূল্য উষ্মীষ খুলিয়া পড়িল, শাহ্‌জহান সক্রোধে বলিলেন, “আসদ্ খাঁ, সাক্ষী অনিবার আবশ্যক নাই। আমি যখন শাহ্‌জাদা ছিলাম, তখন আমাকে অসহায় দেখিয়া এই ফিরিজিগণ আমার সমস্ত দাসদাসী বন্দী করিয়া আমাকে ও আমার স্ত্রীকে অত্যন্ত অপমান করিয়াছিল। আমি বাদশাহ্ হইয়াও তাহাদিগের সকলকে উদ্ধার করিতে পারি নাই।”

বাদশাহের ক্রোধ দেখিয়া আসদ্ খাঁ ভয়ে পশ্চাৎপদ হইলেন। বাদশাহ্ বলিতে লাগিলেন, “ফিরিজি পৰ্তুগীজেরা পিতাকে বলিয়াছিল যে শাহ্‌জাদা খুর্রম বাদশাহের বিরুদ্ধে আমাদের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আমরা সাহায্য না করায় তিনি মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছিলেন। আমার পত্নীর দুইটি দাসী এখনও সপ্তগ্রামে বন্দী আছে। শীঘ্রই পৰ্তুগীজ বণিকের দর্পচূর্ণ করিব; ওয়াইল্ড, তুমি আমাকে সাহায্য করিতে পার ?”

“জহাপনার হুকুম।”

“পৰ্তুগীজের জাহাজ দেখিলেই মারিবে, পৰ্তুগীজের পণ্য দেখিলেই লুটিবে, তাহা হইলে স্বা বাঙ্গালা ও উড়িষ্যাঘু কুঠী খুলিতে পারিবে।”

স্বরট বন্দরের ইংরাজ কোম্পানীর প্রধান সম্মান অভি-
বাদন করিয়া কহিল, “বাদশাহের ফর্মাণ পাইলেই পারি।”

“কল্য প্রভাতে ফর্মাণ পাইবে।”

তখন ইংরাজ কোম্পানি পৰ্তুগীজ বণিকের প্রতিদ্বন্দী ;
আরব সমুদ্রে, পারস্য উপসাগরে ও স্বরটে ইংরাজ বণিকের
সহিত পৰ্তুগীজগণের বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বাদ-
শাহের মুখে এই অপ্রত্যাশিত স্তম্ভ সংবাদ শুনিয়া ওয়াইল্ড
সানন্দে তিনবার ভূমি চুষন করিয়া অভিবাদন করিল। বাদশাহ
উজীরকে কহিলেন, “সাহেব, ফিরিঙ্গি দমন ফিদাইখার কার্য
নহে, কল্য কাসেমখাঁকে তলব করিবেন, দেবেন্দ্রনারায়ণের পুত্র
হাজারী মনসবদার।”

সকলে অভিবাদন করিলেন ; তজ্জাম আসিল, বাদশাহ
রঙ্গমহলে প্রবেশ করিলেন। ৮

ময়ূখ যখন গৃহে ফিরিতেছিলেন তখন অন্ধকারে এক
ব্যক্তি তাঁহার মস্তকে আঘাত করিল, তিনি চেতনা হারাইয়া
পড়িয়া গেলেন। তখন একজন পুরুষ ও একটি রমণী তাঁহার
দেহ একখানি ছোট নৌকায় তুলিল এবং যমুনা বাহিয়া দুর্গের
পার্শ্ব ফটকে প্রবেশ করিল। অন্ধকারে লুকাইয়া আর এক

ব্যক্তি ময়ূখের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল, নৌকা পাণি ফটকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে সহরে উজীর আসফখার গৃহে সংবাদ দিতে চলিল।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

গুপ্তপথে

যখন চেতনা ফিরিয়া আসিল, তখন ময়ূখ দেখিলেন যে তিনি একটি সঙ্কীর্ণ কক্ষমধ্যে বহুমূল্য শয্যায় শয়ান আছেন। কক্ষটি দুই হস্তের অধিক প্রশস্ত নহে, কিন্তু দীর্ঘে অনন্ত। সেই অপ্রশস্ত গৃহে অস্পষ্ট আলোকে ময়ূখ দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার শিয়রে এক ভয়ঙ্করী রমণীমূর্তি বসিয়া আছে। তাহার নাসিকা নাই বলিলেই হয়, চক্ষু দুইটি ক্ষুদ্র, কোটরগত, বর্ণ হরিদ্রাভ। তাঁহার চেতনা ফিরিয়াছে দেখিয়া, রমণী শয্যার নিকটে আসিল, ময়ূখ দেখিতে পাইলেন যে তাহার কটিদেশে দীর্ঘ কুপাণ আবদ্ধ রহিয়াছে। রমণী তাতারী, তখন ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় তাতার রমণী ব্যতীত অত্র কোন জাতীয় স্ত্রীলোক মোগল বাদশাহের অন্তঃপুরে প্রতিহারীর পদ পাইত না। ময়ূখ কয়েক বৎসর আগ্রায় থাকিয়া তাতার চিনিয়া-ছিলেন; তিনি ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি জানিতেন

তাত্ত্বীর অসাধ্য কার্য্য নাই। তাতারী নিকটে আসিয়া বলিল, “জাগিয়াছিস? বড় জোর চোট লাগিয়াছিল, না? একটু সরাব পি।” রমণী বস্ত্রমধ্য হইতে চন্দ্রনির্ম্মিত আধার বাহির করিল, তাহার মুখে স্বরার তীব্র গন্ধ, স্নানাতাবজ্জনিত অঙ্গের দুর্গন্ধের সহিত মিশিয়া, তাহাকে অভিভূত করিয়া তুলিল; ময়ূখ মুখ ফিরাইয়া লইলেন। তাতারী হাসিয়া উঠিল এবং ময়ূখের মুখময় স্বরা ছড়াইয়া দিল। তিনি তখন দুর্বল, ধীরে ধীরে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তখন রমণী আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিল, ময়ূখ মুক্ত হইবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু পারিলেন না। পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া তাতারী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। ময়ূখ ফিরিয়া দেখিলেন যে শয্যাপাশ্বে দুইটি সুন্দরী যুবতী দাঁড়াইয়া আছে। প্রথম বিদেশিনী, তাহার বর্ণ গোলাপের ঞায় হইলেও উগ্র, কেশ পিঙ্গল বর্ণ, এবং চক্ষুর মণি পীতবর্ণ; দ্বিতীয়া, স্নিগ্ধ পদ্মরাগবর্ণা, তাহার কুঞ্চিত আর্দ্র কৃষ্ণ কেশরাশি ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার নীল নয়নদ্বয়ে চঞ্চল ভ্রমরবৎ কৃষ্ণ তারকা দুইটি সর্বদাই যেন নৃত্য করিতেছে। ময়ূখ বিস্মিত হইয়া তাঁহাদিগের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল দ্বিতীয়া তাঁহার পরিচিতা। জীবনের কোন এক তমসচ্ছন্নযুগে বিস্মৃতির অন্ধকার মধ্যে এই সুন্দর মুখখানি উজ্জ্বল আলোকের ঞায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে করে? সে কোথায়?

সহসা বীণানিন্দিত কণ্ঠে উচ্চারিত হইল, “শাহ্জাদী, উনি

যে আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না ?” দ্বিতীয়া এই বলিয়া রেশমের রুমাল দিয়া চক্ষু মুছিল ।

তখন প্রথমা কহিলেন, “সবুওয়ার খাঁ, তুমি তোমার বিবাহিতা পত্নীকে চিনিতে পারিতেছ না ?”

ময়ূখের মস্তক তখন ঘূর্ণিত হইতেছিল, তিনি কক্ষের প্রাচীর ধরিয়া দাঁড়াইলেন ।

প্রথমা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি জান আমি কে ?”

ময়ূখ সন্তয়ে কহিলেন, “না ।”

“আমি শাহ্‌জাদী জহানারা বেগম ।”

ময়ূখ শিহরিয়া উঠিলেন এবং বাদশাহ্‌জাদীকে অভিবাদন করিলেন ।

শাহ্‌জাদী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কোথায় আসিয়াছ জান ?”

“না ।”

“তুমি কেন এখানে আসিয়াছ তাহা জান ?”

“না ।”

শাহ্‌জাদী দ্বিতীয়া রমণীকে দেখাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইনি কে ?”

ময়ূখ ধীরে ধীরে কহিলেন, “তাহাত বলিতে পারি না ।”

“ইহাকে কখনও দেখিয়াছ ?”

“স্মরণ হয় না ।”

“মিথ্যা কথা, খোজা ?”

সঙ্গে সঙ্গে দুইজন কাকী ও দুইজন তাতারী প্রতিহারী ময়ূখের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি অভ্যাসবশতঃ কটিদেশে হস্তার্পণ করিলেন দেখিলেন, তরবারি নাই। খোজাঘয় তাঁহার হস্তধারণ করিল, শাহজাদী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেখ, ইহাকে চিনিতে পার ?”

“না।”

“তোমার নাম কি ?”

“আমার নাম ময়ূখ।”

“মিথ্যা কথা, তোমার নাম সরুওয়ার খাঁ।”

ময়ূখ বিস্মিত হইয়া কহিলেন, “শাহজাদী আপনি যে নাম উচ্চারণ করিলেন তাহা আমি কখনও শুনি নাই। আমি হিন্দু, আমার নিবাস বাঙ্গালা মূলুকে, আমার নাম ময়ূখ, আমার পিতার নাম দেবেজনারায়ণ। আসদ্ খাঁ, শাহনওয়াজ খাঁ প্রভৃতি আমীরগণ আমার পরিচয় অবগত আছেন।”

তখন দ্বিতীয়া শাহজাদীর কর্ণমূলে কহিল, “বেগম সাহেব উনি পাগল হইয়া অবধি ও ঐরকম বলেন। বাঙ্গালা মূলুকে সরকার সাতগাঁয়ে পিতাকে প্রথমে ঐরূপ পরিচয় দিয়াছিলেন। সমস্তই অদৃষ্টের দোষ ; আমি কি করিব বাদশাহজাদী।”

দ্বিতীয়া এই বলিয়া পুনরায় ক্রমাল দিয়া চক্ষু মুছিল। শাহজাদী তাহাকে শাস্ত করিবার জ্ঞাত আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, “তুই কাঁদিতেছিস কেন, গুলঝু ? আমি দুইদিনে খাঁ সাহেবের পাগলামী সারাইয়া দিব। সরুওয়ার খাঁ, তুমি হিন্দু নহ,

তুমি মুসলমান, তোমার নাম সবুওয়ার খাঁ, তুমি এই বিবির থসম্।”

“বেগম সাহেব, আমি এক বর্ণও মিথ্যা বলি নাই।”
গুলরুখ্ বেগম পুনরায় বাদশাহ্জাদীর কর্ণমূলে কহিলেন,
“শাহজাদী ও বন্ধপাগল, উহার সহিত তর্ক করিয়া কি হইবে?”
শাহজাদী হাসিয়া কহিলেন, “আমি তর্ক করিব না, ভাল
কথায় না বুঝিলে জোর করিয়া সম্বাইয়া দিব।” “উহাকে অল্প
কথা বলুন।”

গুলরুখ্ কিয়ৎক্ষণ শাহজাদীর সহিত পরামর্শ করিলেন,
তখন শাহজাদী ময়ূখকে পুনর্বার কহিলেন, “তুমি হিন্দু হইলেও
তোমাকে মুসলমান হইতে হইবে, আর আমার ছকুমে এই
বিবিকে সাদী করিতে হইবে।”

ময়ূখ ভূমি স্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিলেন এবং কহিলেন,
“শাহজাদী, আপনি দীন ও দুনিয়ার মালিক, আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি,
আপনি ইচ্ছা করিলে আমাকে জানে মারিতে পারেন; কিন্তু
আমি হিন্দু, আমি ধর্ম বিসর্জন দিব না, অথবা ঘবনীকে বিবাহ
করিব না।”

“বিবেচনা করিয়া দেখ।”

“শাহ্জাদীর বহুৎ মেহেরবাগী। আমার অল্প জবাব নাই।”

“খাঁ সাহেব, শাহজাহান বাদশাহের মূলুকে মুসলমান
যদি কাফের বলিয়া পরিচয় দেয় তাহা হইলে তাহার কি শাস্তি
হয় জান?”

“জানি শাহ্‌জাদী, কিন্তু আমি ত মুসলমান নহি, স্বতরাং কোরীণের দণ্ড আমার প্রাপ্য নহে।”

“তুমি ইচ্ছা করিয়া শূলে যাইবে?”

“যদি তাহাই আপনার অভিপ্রেত হয় সানন্দে যাইব।”

“তবে যাও।”

খোজাওয় ময়ূখের চক্ষু বাঁধিয়া তাহাকে স্বল্পে উঠাইল এবং ক্ষতপদে স্থানান্তরে লইয়া গেল। কক্ষ পরিত্যাগ কালে ময়ূখ শুনিতে পাইলেন সে গুলরুখ্ বলিতেছেন, “শাহ্‌জাদী মোশা করেন নাই ত?”

ময়ূখ কক্ষ হইতে নীত হইলে শাহ্‌জাদী প্রস্থান করিলেন। যে স্থানে ময়ূখ শয়ন করিয়াছিলেন সে স্থানটি কক্ষ নহে, আগ্রা দুর্গের অন্তঃপুরে বিশালকায় প্রাচীর মধ্যে একটি গুপ্ত পথ মাত্র। জাহানারা বেগম প্রস্থান করিলে গুলরুখ্ তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাতারী সহস্রা তাঁহার হস্তধারণ করিল। গুলরুখ্ বিস্মিতা হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। সে কহিল, “বেগম সাহেব, একটা কথা রাখিবে?” গুলরুখ্ হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিলেন, “কি কথা?”

“আগে বল রাখিবে?”

“না জানিয়া শুনিয়া কেমন করিয়া প্রতিজ্ঞা করিব?”

“তোমার খসমটা তাল্লাক দাও।”

“কেন বল দেখি?”

“অমন কড়া খসম তুমি পোষ মানাইতে পারিবে না।”

“আমি পারি না পারি তাহাতে তোর কিরে হারামজাদী?”

“খবরদার মুখ সামাল! বেগম, ও খসম্ তুমি ভোগ করিতে পারিবে না, অন্ততঃ আমি জীবিত থাকিতে নয়।”

“তোকে কুস্তা দিয়া খাওয়াইব।”

“এখান হইতে ফিরিয়া গেলে তবেত?”

তাতারী এই বলিয়া কটিদেশ হইতে সুদীর্ঘ কুপাণ বাহির করিল এবং ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় লক্ষ দিয়া গুলকুখ্ বেগমকে আক্রমণ করিল। গুলকুখ্ অস্ত্রহীনা, তাতারীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার তাঁহার কোন উপায়ই ছিল না। তাতারী বজ্র মুষ্টিতে তাঁহার কেশরাশি ধারণ করিয়া কুপাণ উদ্ধে তুলিল। গুলকুখ্ যথাসাধ্য চীৎকার করিতে লাগিলেন। আগ্রা দুর্গের প্রাচীর এমন কোশলে নিশ্চিত যে গুপ্তপথে বন্দুকের আওয়াজ করিলেও তাহা বহির্দেশ হইতে শুনা যাইত না। কুপাণ গুলকুখের স্বক্ষ স্পর্শ করিবার পূর্বে কে তাহা তাতারীর হস্ত হইতে ছিনাইয়া লইল, সঙ্গে সঙ্গে তাতারী দশ হস্ত দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। গুলকুখ্ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং দেখিলেন যে তাতারীর গ্রীবা ধারণ করিয়া একজন কৃষ্ণবর্ণ খর্বাকৃতি মনুষ্য তাহাকে ক্ষিপ্ৰহস্তে বন্ধন করিতেছে।

বন্ধন শেষ হইলে সে গুলকুখের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল। তাঁহাকে উপদেবতা ভাবিয়া গুলকুখ্ ভয়ে ও বিস্ময়ে অর্দ্ধমৃত হইয়াছিলেন, তিনি বাক্যব্যয় না করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন। অর্দ্ধদণ্ড পরে শত শত

খোজা ও তাতারী প্রহরী আসিয়া পড়িল, তাহারা রজ্জুবন্ধ তাতারী প্রতিহারীকে দেখিতে পাইল; কিন্তু সেই কৃষ্ণবর্ণ খর্বাকৃতি মনুষ্যকে খুঁজিয়া পাইল না।

বিংশ পরিচ্ছেদ

অন্বেষণে

দ্বিতীয় প্রহরের নৌবৎ বাজিয়া থামিয়া গেল, তখনও ময়ূখ গৃহে ফিরিলেন না দেখিয়া বিনোদিনী বড়ই চিন্তিতা হইয়া পড়িয়াছিল। তর্করত্ন দীর্ঘকাল পরে ময়ূখের সন্ধান পাইয়া দেশে ফিরিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন এবং ললিতার বিবাহ, গৌরী-পুরে প্রত্যাগমন, পরগণা বারবক্ সিংহের সনন্দ প্রাপ্তি ইত্যাদি নানা কথায় রাত্রির প্রথম দুই প্রহর কাটিয়া গেল। দিল্লী ফটকে মধ্যরাত্রির নৌবৎ আরম্ভ হইলে, বিনোদিনীর চেতনা হইল। তর্করত্ন তাহাকে চিন্তিতা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা, কি ভাবিতেছ?” তখন বিনোদিনী কহিল, “বাবা, অনেক রাত্রি হইয়া গেল, বাপ আমার ফিরিল না কেন?”

“কত রাত্রি হইয়াছে?”

“দ্বিতীয় প্রহর শেষ হইয়া তৃতীয় প্রহর আরম্ভ হইল।”

“এত অধিক রাত্রি অবধি বাদশাহত দরবারে থাকেন না।
আমি দেখিয়া আসি।”

তর্করত্ন বিনোদিনীর গৃহ হইতে বাহির হইয়া আগ্রা দুর্গের দিল্লী ফটক পর্য্যন্ত আসিলেন। ময়ূখকে না দেখিতে পাইয়া তিনি দিল্লীর ফটক হইতে অমর সিংহ ফটকের সম্মুখ পর্য্যন্ত গেলেন। তখন আগ্রা দুর্গের চতুর্দিক জনশূন্য ; মনসবদার-গণের শিবিরে শিবিরে এক একজন গ্রহরী ব্যতীত সকলেই সুষুপ্তিমগ্ন, অমরসিংহ ফটক জনশূন্য। তর্করত্ন বিফলমনোরথ হইয়া গৃহে ফিরিলেন। বিনোদিনী ও ললিতা তাঁহার প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলেন। তাঁহাকে একাকী ফিরিতে দেখিয়া ললিতার নয়ন দিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। তর্করত্ন বিনোদিনীকে কহিলেন, “মা, তুমি ব্যস্ত হইও না, আমি এখনই নবাব যামিন-উদ্দৌলার নিকট যাইতেছি, এখনই সংবাদ লইয়া আসিতেছি। কোতয়াল এখনই খুঁজিয়া বাহির করিবে।”

বিনোদিনী চক্ষু মুছিতে মুছিতে কহিল, “বাবা, আপনি যাহা ভাল বিবেচনা করেন করুন, রাত্রি অধিক না হইলে আমি বাদশাহ্ বেগমের নিকটে গিয়া কাঁদিয়া পড়িতাম।”

তর্করত্ন তাহাকে আশ্বাস দিয়া যামিনউদ্দৌলা আসফখাঁর গৃহে চলিলেন। তিনি যখন সপ্তগ্রাম হইতে শাহনওয়াজখাঁর সহিত আগ্রায় আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সহিত আসফখাঁর পরিচয় হইয়াছিল। বুদ্ধিজীবী আসফখাঁ বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে রাজ-

কার্যে নিযুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ময়ূখের সন্ধান না পাইয়া বুদ্ধ ব্রাহ্মণের মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তিনি কৰ্ম্মগ্রহণ না করিয়া তীর্থ ভ্রমণের ছলে আগ্রা পরিত্যাগ করিলেন।

তর্করত্ন যখন আসফখাঁর গৃহে প্রবেশ করিলেন, বুদ্ধ নবাব তখনও অন্তঃপুরে যান নাই। অনেক কৰ্ম্মচারী ও খোজাকে পরিচয় দিয়া বুদ্ধ ব্রাহ্মণ বাদশাহের শ্বশুরের সাক্ষাৎ পাইলেন। একজন খোজা তাঁহাকে চিনিত; সে দয়াপরবশ হইয়া বিদেশীয় বুদ্ধকে নবাবের নিকট লইয়া গেল। আসফখাঁ যমুনাতীরে বার দুয়ারীতে বসিয়াছিলেন। সুন্দরী ইরাণী ক্রীতদাসীগণ তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিতেছিল, বহু সভাসদ আমীর ও মরহা মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। আসফখাঁ তর্করত্নকে দূর হইতে দেখিয়াই চিনিয়াছিলেন। বুদ্ধ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। তৃতীয় প্রহর রাত্রিতে বুদ্ধের আগমনের কারণ শুনিয়াই আসফখাঁ মজলিস্ ত্যাগ করিয়া উঠিলেন; নৃত্য থামিল, মজলিস্ ভাঙ্গিয়া গেল। কক্ষান্তরে আসিয়া নবাব বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হইয়াছে?”

বুদ্ধ ময়ূখের দিল্লী আগমন, বিনোদিনীর বাদশাহ বেগমের সহিত পরিচয় এবং ময়ূখের দেওয়ান-ই-খাসে আগমন প্রভৃতি সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিলেন, “নবাব সাহেব, আমি যখন নানা দেশে ময়ূখের সন্ধান করিয়া বেড়াইতে ছিলাম, তখন সে এই নগরেই ছিল। আমি যখন হতাশ হইয়া আগ্রা ত্যাগ

করি, তখনও সে আগ্রায় ছিল। এতদিন পরে তাহার সন্ধান পাইলাম বটে, কিন্তু দর্শন পাইলাম না।”

উজ্জীর তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, “আপনি ব্যস্ত হইবেন না, আমি যখন তাহাকে দেখিয়াছি তখন আপনিও তাহাকে দেখিতে পাইবেন।”

“তাহার জন্ম তাহার পুরজন বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।”

“আপনি তাঁহাদিগকে শাস্ত করুন, ব্যস্ত হইলে চলিবে না; আমি তাঁহার উপর নজর রাখিয়াছি।”

“সে কবে ফিরিবে? কবে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব?”

“তাহা বলিতে পারি না, তবে শীঘ্রই ফিরিবেন, শীঘ্রই তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবেন। আপনার সহিত যে ফকীর সপ্তগ্রাম হইতে আগ্রা আসিয়াছিল সে এখন কোথায় আছে?”

“কাহার কথা বলিতেছেন, চৈতন্যদাস?”

“নাম স্মরণ নাই, হুগলীতে পৰ্ভুগীজ পাদ্রী যাহার অস্থি চূর্ণ করিয়াছিল তাহারই সন্ধান করিতেছি।”

“সে বৃন্দাবনেই আছে।”

“কোথায় আছে?”

“শচীনন্দন গোস্বামীর আশ্রয়ে আছে, ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করে।”

“তাহাকে আগ্রায় আনিতে হইবে।”

“সে বোধ হয় আসিতে চাহিবে না।”

“বাদশাহের আদেশ, তাহাকে শাহনশাহের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে।”

“মথুরার ফৌজদারকে আদেশ করুন, তাহাকে যেন পাঙ্কীতে পাঠাইয়া দেয়, পর্ভুগীজ পাদ্রীর অনুগ্রহে চৈতন্যদাস চলচ্ছিত্তিরহিত।”

উজীর করতালিধ্বনি করিলেন, একজন খোজা আসিয়া অভিবাদন করিল, আসফ খাঁ খাসনবীশকে ডাকিয়া দিতে আদেশ করিলেন। অবিলম্বে খাসনবীশ আসিল, উজীর চৈতন্যদাসকে আগ্রায় পাঠাইবার জন্য পত্র লিখিলেন। তৃতীয় প্রহর অতীত হইল, দিল্লী ফটকে নৌবৎ বাজিয়া উঠিল। রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে দেখিয়া তর্করত্ন বিদায় চাহিলেন। বিদায় দিবার সময়ে উজীর তাঁহাকে পরদিন আমদরবারে ও গোসলখানায় উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ করিয়া, খাস চৌকীর মনসবদার স্বীয় পুত্র শায়েস্তা খাঁর নামে পত্র দিলেন। তর্করত্ন ময়ূখের গৃহে ফিরিলেন।

তিনি বিদায় হইলে আসফ খাঁ পুনরায় করতালিধ্বনি করিলেন, একজন খোজা কক্ষে প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল। উজীর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “খাওয়াস্ আমানৎ খাঁ ফিরিয়াছে?” খোজা কহিল, “জনাব, হাঁ।”

“তাঁহাকে ডাকিয়া আন।”

খোজা অভিবাদন করিয়া নিজ্রাস্ত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার সহিত অতি কুৎসিত কুজপৃষ্ঠ একজন হাবসী কক্ষে

প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল। আসফ্ খাঁ তখন অবনত বদনে চিন্তা করিতেছিলেন। খোজা দ্বয় কৃষ্ণমর্মে খোদিত পাষণ্মূর্তির ন্যায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অর্দ্ধদণ্ড পরে উজীর মুখ তুলিলেন, তখন কুজপৃষ্ঠ খোজা পুনরায় অভিবাদন করিল। আসফ্ খাঁ জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমানৎ খাঁ ?” খোজা কহিল, “জনাব !”

“সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়াছ ?”

“জনাব, সমস্ত শেষ।”

“বান্ধালী কোথায় গেল ?”

“জনাব, সে সাতার দিয়া পাণিফটক পার হইয়া রঙ্গমহলে প্রবেশ করিয়াছে।”

“কেহ দেখিতে পায় নাই ত ?” “আলম্পনা, বুড়া বান্ধালী জলের ভিতর ডুবিয়া সাতার দিয়া ত্রিশ গজ পরিখা ও পাঁচ গজ লহর পার হইয়া রঙ্গমহলে প্রবেশ করিয়াছে।”

“সাবাস, তাহার কথা অন্তরে বলিয়া আসিয়াছ ?”

“সরদারনী মেহেদী বিবিকে বলিয়া আসিয়াছি, হিলাল খাঁর মুখে রঙ্গমহলের বখ্শী হিন্মত খাঁ যাকুৎকে খবর দিয়াছি।”

“বান্ধালী রাজাকে কয়েদ করিল কে ? সে খবর লইয়াছ ?”

“সমস্ত খবর পাই নাই তবে সন্ধ্যার পরে যাকুৎ বাদী গুলজার আর কালমক্ ইরাদৎ খাঁ নৌকায় করিয়া পাণি ফটকে আসিয়াছিল, ইরাদৎ খাঁ সেখানে নামিয়া গিয়াছিল, গুলজার বাদী নৌকা লইয়া রঙ্গমহলে প্রবেশ করিয়াছে। বুড়া বান্ধালী

বুলিয়াছিল যে, তাহার রাজাকে একজন মরদ ও একজন আওরং নৌকায় করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। গুলজার বিবিই যে বাঙ্গালী রাজাকে কয়েদ করিয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।”

“উত্তম, তুমি যাও।”

খোজাঘর অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল, আসফ্ খাঁ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। সার্ক তৃতীয় প্রহরে বিস্তৃত মোগল সাম্রাজ্যের প্রধান অমাত্যের বিশ্রামের অবসর হইল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

নবাব আলিয়া বেগম

আগ্রা দুর্গের অভ্যন্তরে বাদশাহের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার দুইটি প্রকাশ্য পথ ছিল, একটি দিল্লী ফটকে ও অপরটি অমরসিংহ ফটকের সম্মুখে। এতদ্ব্যতীত পাণি ফটক দিয়াও অন্তঃপুরে প্রবেশ করা যাইত, কিন্তু সে পথ কেবল বাদশাহের অবরোধবাসিনী রমণীগণের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এই তিনটি প্রকাশ্য পথ ব্যতীত আগ্রা দুর্গের অন্তঃপুর প্রবেশের একটি গুপ্ত পথ ছিল, স্বয়ং বাদশাহ্ ব্যতীত অন্য কেহ সে পথ জানিতেন না।

অন্তঃপুরে আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে এক বেগমের মহল হইতে অন্য বেগমের মহলে যাইবার বহু গুপ্ত পথ নির্মিত হইয়াছিল। শাহজহানের আমলে আরজ্-মন্দ বাণু বেগম ব্যতীত মহল সরার অন্য কোন অধিবাসিনী না থাকায়, গুপ্তপথ ব্যবহৃত হইত না। যোধবাই মহলের পশ্চাতে বাদশাহ্ বেগমের হামামের নিম্নে একটি গুপ্ত গৃহ আছে। এই গৃহে এখনও একটি বধমঞ্চ দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও অন্তঃপুরচারিণী রীতি-বিরুদ্ধ আচরণ করিলে, বাদশাহ্ অথবা প্রধানা বেগম এই গৃহে তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতেন। মোগল সাম্রাজ্যের যুগের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে আত্রা দুর্গে শ্বেত ও রক্তমন্মরনির্মিত বিশাল প্রাসাদের নিম্নে পথবিচলিতা অন্তঃপুরচারিণীর জীবননাট্যের শেষ অঙ্ক যে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইত, তাহা এখনও দর্শকের মনে ভীতি সঞ্চার করিয়া থাকে।

বহুদিন এই বধমঞ্চ ব্যবহৃত হয় নাই; বাদশাহের অন্তঃপুরে বহুদিন কোনও অবরোধবাসিনী স্বীয় রক্তশ্রোতে স্বেচ্ছাচারের প্রায়শ্চিত্ত করেন নাই; বহু দিন সে কক্ষে কেহ প্রবেশ করে নাই। কক্ষ আবর্জ্ঞনাময়, গৃহতল ধূলায় আচ্ছন্ন, বহুদিন পরে সহসা সেই অন্ধকার গৃহ বহু মশালের আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। চারিজন খোজা ময়ূখকে লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহাদিগের সম্মুখে পাঁচজন ও পশ্চাতে পাঁচজন তাতারী প্রতিহারী মশাল হস্তে প্রবেশ করিল, পরে গুলুধুখ্ ও জহানারা বেগম আসিলেন। সর্বশেষে কুঠার হস্তে এক

জন খোজা ও রজ্জু হস্তে একজন তাতারী কক্ষে প্রবেশ করিয়া
স্বার রুদ্ধ করিল।

খোজাগণ ময়ূথকে নামাইয়া তাঁহার বন্ধন মোচন করিল
এবং তাঁহাকে জহানারা বেগমের সম্মুখে রাখিয়া দূরে সরিয়া
দাঁড়াইল। মশাল হস্তে তাতারীগণ প্রাচীরের পার্শ্বে সারি দিয়া
দাঁড়াইল। যে কুঠারহস্তে আসিয়াছিল, সে বহুদিনের রক্তশ্রোতে
বিবর্ণ কাষ্ঠখণ্ড টানিয়া লইয়া আঘাতের জন্য প্রস্তুত হইল।
তাতারী ফাঁসীকাষ্ঠে রজ্জু লাগাইয়া গৃহতলের মধ্যদেশে হইতে
কাষ্ঠখণ্ড সরাইয়া ফেলিল, সঙ্গে সঙ্গে যমুনা-জলের কুলুকলুধ্বনি
শ্রুত হইল।

শাহ্‌জাদী জিজ্ঞাসা করিলেন, “সরুওয়ার খাঁ, দেখিতেছ ?”
ময়ূথ দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাজুষ্ঠে উপবীত জড়াইয়া চক্ষু মুদ্রিত
করিলেন। শাহ্‌জাদী কহিলেন, “দেখ এখনও যদি ধর্মপত্নীকে
গ্রহণ কর, তাহা হইলে মুক্তি পাইতে পার।”

ময়ূথ মুদ্রিতনয়নে কহিলেন, “শাহ্‌জাদী, আমি হিন্দু,
প্রাণভয়ে মিথ্যা কথা বলিব না। আমি ব্রাহ্মণ, মুসলমান নহি,
আমার নাম ময়ূথ, সরুওয়ার খাঁ নহে, এই রমণীকে আমি চিনি
না। আমি মরণের জন্য প্রস্তুত, বিলম্ব করিয়া যন্ত্রণা বাড়াইবেন
না।”

“তুমি পত্নীগ্রহণ করিবে না ?”

“আমার পত্নী নাই, কারণ এখনও আমার বিবাহ হয়
নাই।”

“এখনও ভাবিয়া দেখ ।”

“শাহ্‌জাদী, মিথ্যা বলি নাই, যবনী বিবাহ করিব না, ধর্মত্যাগ করিব না, মরণের রাজ্যে আসিয়া মিথ্যা বলি নাই ।”

শাহ্‌জাদী ইঙ্গিত করিলেন, জল্লাদ ময়ূখের হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিল। সহসা সেই ভূগর্ভস্থিত গৃহের ঘন অন্ধকার অপেক্ষা ঘন কৃষ্ণবর্ণ মসীপিণ্ড প্রাচীর হইতে লক্ষ দিয়া গৃহতলে অবতীর্ণ হইল এবং পদাঘাতে রক্তপদে জল্লাদকে যমুনাতলে প্রেরণ করিয়া পুনরায় প্রাচীরের অন্ধকারে মিশিয়া গেল। ময়ূখ বিস্মিত হইয়া রহিলেন, অশ্রুট শব্দ করিয়া গুলরুখ্‌ মূর্ছিতা হইল, ভয়ে শাহ্‌জাদীর দেহ স্বেদাপ্লুত হইল।

অনেকক্ষণ কেহ কথা কহিল না। পরে ময়ূখ কহিলেন, “শাহ্‌জাদী, বিলম্বে প্রয়োজন নাই, কুঠার গিয়াছে, কিন্তু রজ্জু আছে, আবশ্যক হইলে আমি সহস্বে তাহা কণ্ঠে বেঁধেন করিব।”

শাহ্‌জাদী নীরব, যে তাতারী রজ্জু ধরিয়াছিল, সে দেখিল যে রজ্জু ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া অন্ধকারে মিশাইয়া গেল! সে “শোভানাল্লা” বলিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। শাহজাদী স্তব্ধ। এই সময়ে সেই মসীপিণ্ড প্রাচীর হইতে একজন খোজার মুখে ভীষণ বেগে পদাঘাত করিল, তাহার হস্ত হইতে তরবারি পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেই মসীবর্ণ পুরুষ এক লক্ষ্যে গৃহতলে অবতরণ করিয়া দ্বিতীয় খোজার মস্তকে অসির আঘাত করিল, খোজার মস্তক স্ফটক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জহানারা বেগমের দেহে পড়িল। তখন অবশিষ্ট খোজা ও তাতারীগণ তাঁহাকে

বেঠেন করিয়া দাঁড়াইল। সেই মসীপিণ্ড ময়ূখকে কহিল,
“মহারাজ, দুই খানা তলোয়ার পড়িয়া আছে, দুয়ার হাবসীদের
পিছনে।”

ময়ূখ চিত্রাপিতের দ্বায় দাঁড়াইয়াছিলেন, মসীপিণ্ডের
কথা শুনিয়া তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি তরবারি গ্রহণ
করিলেন। আগন্তকের কথা শুনিয়া খোজাদিগের ভয় ভাঙ্গিল,
একজন কহিল, “ওরে জীন নহে, মানুষ।” দ্বিতীয় ব্যক্তি
কহিল, “পাগল আর কি? মানুষ হইলে কখন আসামানে
উঠিয়া যাইতে পারে?” তখন সেই মসীপিণ্ড পুনরায় কহিল,
“হাঁ, আমি মানুষ।” ময়ূখ এতক্ষণে তাহাকে চিনিলেন এবং
জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভূবন?”

ভূবন কহিল, “হুজুর, বিলম্ব করিয়া কাজ নাই।”

সেই মুহূর্ত্তে খোজা ও তাতারীগণ তাহাদিগকে আক্রমণ
করিল, অনেকগুলি উদ্ধা নিবিয়া গেল, বধমঞ্চ পুনরায় অঙ্ক-
কারপ্রায় হইল, এই সময়ে গুলরুখের চেতনা ফিরিল।
সহসা গুলরুখ শাহজাদীর পদতলে পতিত হইয়া কহিলেন,
“শাহজাদী মারিও না, আমি আর একবার বুঝাইয়া দেখি।”
জহানারা বেগমের মন ভিজিল, তিনি ইঙ্গিত করিলেন,
খোজাগণ নিরস্ত হইল। তাহা দেখিয়া ভূবন এক লক্ষ্মে ফাসী
কাঠে উঠিয়া অঙ্ককারে মিশিয়া গেল।

পুনরায় মশাল জ্বলিল। খোজা ও তাতারীগণ সেই ভূগর্ভ-
স্থিত পুরী তন্ন তন্ন করিয়া অহুসঙ্কান করিল; কিন্তু ভূবনকে

দেখিতে পাওয়া গেল না। তখন গুলরুথের অমুরোধে খোজা ও তাতারীগণ কক্ষ পরিত্যাগ করিল। শাহ্‌জাদীও কক্ষের বাহিঁরে আসিলেন। গুলরুথ ধীরে ধীরে ময়ূখের দিকে অগ্রসর হইলেন। ময়ূখ তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বিবি, তুমি কে? তুমি কেন আমায় বুখা কষ্ট দিতেছ?” গুলরুথ স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহার হৃদয় জ্বলন্তবেগে স্পন্দিত হইতেছিল, জিহ্বা শুষ্ক হইয়া আসিয়াছিল, গুলরুথের মুখে কথা ফুটিল না। তাহা দেখিয়া ময়ূখ মনে করিলেন যে রমণী অস্ত্র দেখিয়া ভয় পাইয়াছে। তিনি তরবারি দূরে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, “আমি ত আপনাকে চিনি না?”

সহসা গুলরুথের জিহ্বার জড়তা দূর হইল, সে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “তুমি—আপনি—আমাকে চিনিতে পারিলে না?” ময়ূখ কহিলেন, “না।”

“সপ্তগ্রামের যুদ্ধে আহত হইয়াছিলে স্মরণ আছে?”
 “আছে।” “বজ্রায় আমি তোমাকে শুশ্রূষা করিয়াছিলাম—
 স্মরণ আছে?”

“সে কি তুমি?”

“হঁ।।”

“রোগশয্যায় স্বপ্ন দেখিতাম আমার শিয়রে বসিয়া
 ললিতা সেতার বাজাইতেছে, কিন্তু ললিতা ত সেতার বাজা-
 ইতে জানে না?” “সে ললিতা নহে, সে আমি।” “তোমাকে
 ত আমি পূর্বে দেখি নাই?”

“না। জীবনসর্বস্ব, ত্রিবেণীর ঘাটে দূর হইতে তোমাকে দেখিয়া তোমার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছি।”

গুলরুখ্ এই বলিয়া ময়ূখের পদযুগল ধারণ করিলেন। ময়ূখ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন গুলরুখ্ পুনর্বার বলিতে আরম্ভ করিল, “তোমাকে পাইব বলিয়া লজ্জা সরম বিসর্জন দিয়াছি, আসদ্ খাঁ ও শাহ্নওয়াজ খাঁর নিকট পরিচয় দিয়াছি যে আমি তোমার ধর্মপত্নী। তুমি সপ্তগ্রামের যুদ্ধে আহত হইয়া পথে পড়িয়াছিলে, আমি তখন শাহ্নওয়াজ খাঁর সহিত বজরায় যাইতেছিলাম, আমরা তোমাকে পথ হইতে বজরায় উঠাইয়া আনিয়াছিলাম। বজরায় তুমি দুই তিন দিন অজ্ঞান হইয়াছিলে, আমাকে ললিতা বলিয়া ডাকিতে, আমি ভাবিতাম তুমি আমাকে আদর করিতেছ। হুগলীর ফিরিঙ্গিরা যখন আমাদের বজরা ডুবাইয়া দেয় তখন হইতে তোমাকে আর খুঁজিয়া পাই নাই। তাহার পর সে দিন দেখিলাম, তুমি পাণিফটকের নিকট দাঁড়াইয়া আছ। আমি তোমাকে এইখানে আনাইয়াছি, শাহ্জাদীর নিকটও পরিচয় দিয়াছি যে তুমি আমার স্বামী। তোমাকে দেখিবার আশায়, তোমাকে পাইবার আশায়, তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি, তুমি কি আমার হইবে না? দেখ, আমি রমণী, লজ্জা সরম বিসর্জন দিয়া তোমার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি।”

ময়ূখ কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিলেন, “বিবি, আমি হিন্দু ব্রাহ্মণ, আপনি অল্পগ্রহ করিয়া আমাকে ক্ষমা করুন।”

“দেখ তুমি আমার দেবতা, যাহার বাহির এত সুন্দর, তাহার ভিতর কখন মলিন হইতে পারে না ; যাহার এত রূপ সে কখন নিগুণ হইতে পারে না। আমি রমণী, মুন্সী, স্বেচ্ছায় নারীধর্ম বিন্ধিত হইয়া তোমার চরণে আশ্রয় লইতে আসিয়াছি। মুসলমান হিন্দু হইতে পারে, হিন্দুও মুসলমান হইতে পারে, হিন্দু ও মুসলমানের একাধিক পত্নী হইতে পারে। অন্দর মহলে আমার প্রতিপত্তি আছে, আমি বাদশাহ বেগমের অনুগ্রহের পাত্রী, শাহ্নশাহ্ বাদসা আমাকে স্নেহ করেন। তুমি যদি আমাকে চরণে আশ্রয় দাও, তাহা হইলে আমি তোমার জন্ত অসাধ্য সাধন করিতে পারি। মনসব্, খিলাত, ইনাম, তালুক, মদদ্ যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে—”

ময়ূখ তাহাকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, “বিবি সাহেব, আপনার বহুৎ মেহেরবাণী, কিন্তু আমি ত মুসলমান হইতে পারিব না ?”

“আমি হিন্দু হইব।”

“মুসলমান কখনও হিন্দু হইতে পারে না।”

“কেন, বৈষ্যব ত হইতে পারে ?”

“আমি ব্রাহ্মণ, বৈষ্যব হইলে জাতিচ্যুত হইব।”

“দেখ, আমি শাহ্জাদীকে বলিয়াছি যে তুমি সবুওয়ার খা, আমার স্বামী, এক কাকের রমণীর রূপে মোহিত হইয়া হিন্দু হইয়া গিয়াছ। তুমি জান যে মুসলমানের রাজ্যে হিন্দু মুসলমান হইলে ক্ষতি নাই, কিন্তু মুসলমান হিন্দু হইলে তাহার শাস্তি

ক্লাণদণ্ড। তুমি এখন সম্মত না হইলে শাহ্‌জাদী তোমাকে কতলের ছকুম দিবেন।”

“বিবি, আমি মরিতে কাতর নহি।”

“এখন সম্মত হও, পরে না হয় আমাকে তুলিয়া যাইও।”

“অসম্ভব, একবার সম্মত হইলে আবার কেমন করিয়া মিথ্যা কথা বলিব?”

“তবে আমাকে চরণে স্থান দিবে না?”

“বিবি সাহেব, মেহেরবাগী করিয়া আমাকে মাফ করুন, আপনি বাদশাহের পালিতা কন্যা, কত সম্ভ্রান্ত আমীর ওমরাহ্‌, আপনার পাণিগ্রহণের জন্ত লালায়িত, আমি সামান্ত ব্যক্তি, আমাকে অপরাধী করিবেন না।”

“জানি। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তোমাকে ত ভুলিতে পারি নাই? তোমার মুখ বিস্মৃত হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। তুমি আমার জান, আমার কলিজা। আমার জন্ত তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি, তাহার জন্য আমাকে মাফ করিও। যদি পারি তাহা হইলে তোমাকে মুক্তি দিতেছি, কিন্তু যদি না পারি তাহা হইলে তোমার সঙ্গেই মরিব। অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি।”

গুলরুখ ধূলা ঝাড়িয়া উঠিয়া দ্বারে করাঘাত করিলেন, একজন খোজা দ্বার মুক্ত করিল, শাহ্‌জাদী জিজ্ঞাসা করিলেন, “গুলরুখ, তোমার খসম্‌ পোষ মানিয়াছে?”

গুলরুখ্ অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে মিনতি করিয়া কহিলেন, “শাহ্-জাদী, তুমি আজিকার মত উহাকে মাফ্ কর।”

“তবে পোষ মানে নাই ?”

“মানিবে, সময় লাগিবে।”

“সে হইবে না, তোমার খসম্ বলিয়া যে আমার হুকুম তামিল করিবে না আমি তাহা সহ্য করিব না। আমি এখনই তাহাকে কতল করিয়া কালি তোমার নিকা দিব।”

শাহ্-জাদী কক্ষে প্রবেশ করিয়া ময়ূখকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সবুওয়ান্ খাঁ, তোমার বিবিকে লইয়া যাইবে ?”

“আমার ত বিবি নহে শাহ্-জাদী ?”

“আবার মিথ্যা কথা ?”

মিথ্যা বলি নাই।”

“জল্লাদ !” এইবার বিংশতি খোজা ময়ূখকে বেঁধে রাখিল, দ্বাদশজন তাতারী মুক্ত তরবারি হস্তে প্রাচীরের চারি দিকে দাঁড়াইল। জল্লাদ ময়ূখের হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিল। তখন উপায়াস্তর না দেখিয়া ভুবন আত্মদমর্পণ করিল এবং শাহ্-জাদীর পদমুগল ধারণ করিয়া কহিল, “শাহ্-জাদী, উহার জন্ম অবধি উহাকে লালন পালন করিয়াছি, আমার সম্মুখে উহাকে মারিও না। দয়া করিয়া, মেহেরবাণী করিয়া আগে আমাকে কতল কর, পরে যাহা ইচ্ছা হয় করিও।” বৃদ্ধের কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, কিন্তু তাহার কাতর আবেদন গ্রাহ্য হইল না।

দুইজন খোজা ময়ূখের মস্তক কাষ্ঠ খণ্ডের উপর স্থাপন

করিল, জল্লাদ কুঠার উঠাইল। সহসা তীব্র উজ্জ্বল সূর্যালোকে কক্ষ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, মুহূর্তের জন্ত সকলে দৃষ্টি শক্তি হারাইল। পরক্ষণেই খোজাগণ অস্ত্র ত্যাগ করিয়া ভূমি চূষন করিল। শাহ্‌জাদীর মুখ শুখাইয়া গেল, গুলঝুখ্ শিহরিয়া উঠিলেন। ময়ূখ দেখিতে পাইলেন যে, অন্ধকারময় কক্ষের একদিকের প্রাচীর সরিয়া গিয়াছে, সেই স্থানে প্রশান্তমূর্ত্তি অপরূপ স্তন্দরী একজন রমণী দাঁড়াইয়া আছেন। সহসা তাঁহার মনে আশার সঞ্চার হইল। খোজা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, ময়ূখ একলক্ষ্যে সেই মাতৃমূর্ত্তির সমীপবর্ত্তী হইলেন এবং তাঁহার পদযুগল ধারণ করিয়া কহিলেন, “মা!”

মাতৃমূর্ত্তি তাঁহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া কহিল, “বেটা, ডব্ব নেহি।”

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

গোসলখানা

দরবার আম শেষ হইল, বাদশাহ্ সিংহাসন হইতে উঠিলেন। দেওয়ান-ই-আমের পশ্চাত্তাগে দ্বিরদরদনির্ম্মিত সুবর্ণমণিমুক্তাখচিত বিচিত্র নালুকী লইয়া আটজন তাতারী অপেক্ষা করিতেছিল, বাদশাহ্ তাহাতে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। অন্ত্যান্ত সভাসদগণ নাকারাতানার ফটক দিয়া প্রস্থান

করিলেন, কেবল উজীর আসফ খাঁ, শাহ্নওয়াজ খাঁ, আসদ্ খাঁ, কাসেম খাঁ, ইনায়েৎ উল্লা খাঁ, বহাদর খাঁ কাছোহ ও দেওয়ান হরেকৃষ্ণ রায়, দেওয়ান-ই-আমের পশ্চাৎস্থিত দ্বার দিয়া দেওয়ান-ই-খাসের চত্বরে প্রবেশ করিলেন। শ্বেতমর্শ্ব-নির্মিত দেওয়ান-ই-খাসের পশ্চাতে গোসলখানা। গোসলখানা মোগল সাম্রাজ্যের মস্তগৃহ, দরবার আমের পরে বাদশাহ্ এইখানে বসিয়া প্রধান অমাত্যগণের সহিত পরামর্শ করিতেন, ভিন্ন ভিন্ন সুবার শাসন সম্বন্ধে আদেশ দিতেন এবং রাজ্যতন্ত্ৰের গোপনীয় কার্যের ব্যবস্থা করিতেন।

সকলে গোসলখানায় প্রবেশ করিয়া দ্বারের দুই পার্শ্বে সারি দিয়া দাঁড়াইলেন, বাদশাহের নাল্কী আসিয়া ছুয়ারে দাঁড়াইল, বাদশাহ্ নামিলেন। সমস্ত সভাসদ্ এক সঙ্গে কুণীশ করিলেন। বাদশাহ্ গদীতে উপবেশন করিলে, উজীর আসফ খাঁ ও শাহ্নওয়াজ খাঁ তাঁহার নিকটে উপবেশন করিলেন, অপর সকলে তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। উপবেশন করিয়াই বাদশাহ্ আসফ খাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সাহেব, নূতন মন্সবদার কোথায়?” আসফ খাঁ বিপদে পড়িলেন, মন্ত্রণা সভায় উপস্থিত সভাসদগণের মধ্যে ময়ূখের কথা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও, তাহা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। বৃদ্ধ উজির অনায়াসে একটা মিথ্যা কথা বলিলেন, তিনি কহিলেন, “জহাঁপনা, নূতন হাজারী মন্সবদার ময়ূখ নারায়ণকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।” বাদশাহ্ অত্যন্ত

বিস্মিত হইয়া কহিলেন, “সে কি কথা সাহেব? যে ব্যক্তি কল্যা রাত্রিতে আমার নিকটে আসিয়াছিল, অত্ৰ প্রভাতে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না? আসদ্ খাঁ! কোতোয়ালকে তলব কর।”

আসদ্ খাঁ কুর্ণীশ করিয়া গোসলখানা পরিত্যাগ করিলেন, তখন বাদশাহ্ করতালিধ্বনি করিলেন। একজন তাতারী প্রতিহারী আসিয়া অভিবাদন করিল, বাদশাহ্ তাহাকে রঙ্গমহলের দারোগা গুলশের খাঁ ও বখ্শী হিম্মৎ খাঁ যাকুৎকে তলব করিতে আদেশ করিলেন। তাতারী অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলে, বাদশাহ্ আসফ্ খাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সাহেব, সুরটের আংরেজ সর্দার ও বাঙ্গালী গওয়াহ্ হাজির আছে?” আসফ্ খাঁ কহিলেন, “জনাবে আলা, সকলেই উপস্থিত আছে।”

আসফ্ খাঁ করতালিধ্বনি করিলেন, খাওয়াস্ আমানৎ খাঁ অভিবাদন করিল, উজীর তাহাকে খাস্ চৌকীর মনসবদার শায়েস্তা খাঁকে ডাকিতে আদেশ করিলেন। মুহূর্ত্ত পরে শায়েস্তা খাঁ আসিয়া কুর্ণীশ করিলেন। আসফ্ খাঁ পুত্রকে সুরট কুঠীর আংরেজ প্রধান ওয়াইল্ড্, তর্করত্ন মহাশয় ও চৈতন্যদাস বাবাজীকে গোসলখানায় আনিতে আদেশ করিলেন। শায়েস্তা খাঁ অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন, তখন আগ্রার কোতোয়াল জফর খাঁ গোসলখানায় প্রবেশ করিয়া কুর্ণীশ করিলেন।

জফর খাঁকে দেখিয়া বাদশাহ্ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, “জফর খাঁ, তুমি খাজা আবুলহসনের পুত্র ; সেই জন্ত তোমাকে আগ্রার কোতয়াল করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন দেখিতেছি যে তুমি নিতান্ত অকর্মণ্য। কল্য রাত্রিতে একজন বাঙ্গালী আমীর, হাজারী মনসব্দার নিযুক্ত হইয়াছে। কল্য রাত্রিতে সে প্রথম প্রহরের শেষ পর্য্যন্ত দেওয়ান-ই-খাসে উপস্থিত ছিল, কিন্তু তাহার পর সে গৃহে ফিরে নাই। তুমি কি কোন সংবাদ পাইয়াছ ?” জফর খাঁ অবনত মস্তকে কহিলেন, “না।”

“অন্ত রজনীতে দেওয়ান-ই-খাসে তাহার সংবাদ আনিতে না পারিলে তোমাকে আগ্রা হইতে দূর করিয়া দিব। গর্দভের পৃষ্ঠে চড়াইয়া আউরতের পোষাক পরাইয়া বাহির করিয়া দিব।”

জফর খাঁ কোতয়াল কাঁপিয়া উঠিলেন এবং অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন আসফ্ খাঁ বাদশাহের কর্ণমূলে কহিলেন, “জইপনা, জফর খাঁর অপরাধ নাই। বখ্শী হিম্মৎ খাঁ যাকুৎ, দারোগা গুলসের্ খাঁ ও সরদারগী মেহেদি বিবি নূতন হাজারী মনসব্দারের খবর দিতে পারিবে।” বাদশাহ্ বিস্মিত হইয়া আসফ্ খাঁর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

এই সময়ে শায়েস্তা খাঁ, ওয়াইল্ড ও তর্করত্ন মহাশয়ের সহিত গোসলখানায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদিগের পশ্চাতে দুইজন খোজা চৈতন্যদাস বাবাজীকে ধরিয়া লইয়া আসিল।

চৈতন্যদাস দাঁড়াইতে না পারিয়া বসিয়া পড়িল। বাদশাহ্, বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিলেন, তাহা দেখিয়া শাহ্‌নওয়াজ খাঁ কহিলেন, “জনাব্ আলি, পৰ্তুগীজ পাদ্রী ইহার দেহের সমস্ত অস্থি চূর্ণ করিয়া দিয়াছে, ইহার দাঁড়াইবার শক্তি নাই।” বাদশাহ্ জিজ্ঞাসা করিলেন, “নবাব সাহেব, পৰ্তুগীজ পাদ্রী ইহার অস্থি চূর্ণ করিল কেন?”

“শাহনশাহ্, তাহা ঐ হিন্দু ফকীরের মুখ হইতেই শুনিবেন।”

আসফ্ খাঁর আদেশে দেওয়ান হরেকৃষ্ণ রায় বাদশাহের প্রশ্ন ও চৈতন্যদাসের উত্তর তর্জমা করিতে লাগিলেন। বাদশাহ্ জিজ্ঞাসা করিলেন, “ফকীর, পৰ্তুগীজ পাদ্রী তোমার উপর অত্যাচার করিয়াছিল কেন?”

“সে আমার বন্ধু সেই জন্ত।”

“সে তোমার বন্ধু?” “মহারাজ, যে পথভ্রান্তকে পথ নির্দেশ করে সেই বন্ধু।”

“তুমি কি পথ ভুলিয়া হুগলী গিয়াছিলে?”

“না, ইচ্ছা করিয়াই গিয়াছিলাম।”

“তবে পথ ভুলিয়াছিলে কোথায়?”

“বৈরাগী হইয়া যখন অর্থের লোভ হইয়াছিল তখনই পথ ভুলিয়াছিলাম।”

“পৰ্তুগীজ পাদ্রী তোমার উপরে অত্যাচার করিল কেন?”

“গোবিন্দের আদেশে।”

“গোবিন্দ কে ?”

“গোবিন্দ অখিল বিশ্বের রাজচক্রবর্তী, বাদশাহের বাদশাহ, আপনার ও আমার প্রভু।”

বাদশাহ্ হাসিলেন, কহিলেন, “ফকীর, খোদা কি তোমার উপর অত্যাচার করিতে পৰ্ত্তুগীজ পাণীকে আদেশ করিয়া-
ছিলেন ?”

“নিশ্চয়, তাহা না হইলে মাছুষের সাধ্য কি যে মাছুষের
অঙ্গে ইন্তুক্ষেপ করে ?”

“ফকীর, তুমি কি পাগল ?”

“মহারাজ, লোভ ও মোহ যখন আমাকে আক্রমণ করিয়া-
ছিল, তখন পাগল হইয়াছিলাম, এখন মদনমোহন দয়া
করিয়াছেন, এখন আর পাগল নই।”

এই সময়ে আসদ্ থাঁ কহিলেন, “শাহান শাহ্ এই ব্রাহ্মণ
সেই স্থানে উপস্থিত ছিল, ইহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সকল
কথা জানিতে পারিবেন।”

বাদশাহের আদেশ অনুসারে তর্করত্ন চৈতন্যদাসের প্রতি
পাদ্রীর অত্যাচারের কথা বলিলেন, তাহা শুনিয়া বাদশাহ্
শিহরিয়া উঠিলেন এবং ওয়াইল্ডকে জিজ্ঞাসা করিলেন,
“আংরেজ, সমস্ত খৃষ্টান পাদ্রী কি এইরূপ অত্যাচার করিয়া
থাকে ?” ওয়াইল্ড অবনত বদনে কহিলেন, “জহাঁপনা, খৃষ্টান
সমাজে কেবল পৰ্ত্তুগীজ ও স্পেনীয় পাদ্রীই এইরূপ অত্যাচার
করিয়া থাকে। ভারতবর্ষে এইরূপ অত্যাচার নূতন, ইহারা

স্বদেশে অন্য মতালম্বী খৃষ্টানদিগের উপরেও এইরূপ অত্যাচার করিয়া থাকে।”

“তাহা হইলে আমার রাজ্যে ইহাদিগকে বাস করিতে দেওয়া উচিত নহে।”

ওয়াইল্ড । শাহনশাহের দরবারে বহুবার আমাদিগের প্রতি পৰ্তুগীজদিগের অত্যাচারের কথা নিবেদন করিয়াছি । জহাঁপনার হুকুম পাড়লে আমরা এত দিন পৰ্তুগীজ পাদ্রী ও দস্যুর অত্যাচার নিবারণ করিতে পারিতাম ।

বাদশাহ্ । দেখ আংরেজ, তুমিও ফিরিজি পৰ্তুগীজও ফিরিজি । তোমরা উভয়েই বাণিজ্য করিতে এ দেশে আসিয়াছ । আমরা মনে করিতাম যে ঈর্ষাবশতঃ তোমরা পৰ্তুগীজ বণিক্দিগকে অপবাদ দিয়া থাক । আমার প্রজার উপরে অত্যাচারের কথা আমি ইহার পূর্বে শুনি নাই ।

ওয়াইল্ড । জহাঁপনা হিন্দুস্থানের সকল সংবাদ কি বাদশাহের কর্ণগোচর হয় ?

আসফ্ খাঁ । জহাঁপনা, ওয়াটীয়ানবীশগণ যে সমস্ত সংবাদ প্রেরণ করে তাহা শুনিতে গেলে বাদশাহের অন্য কার্যের সময় থাকিবে না বলিয়া খাসদবীর বাছিয়া বাছিয়া কতকগুলি পত্র রঙ্গ মহলে পাঠাইয়া দেয় ।

বাদশাহ্ । সাহেব, ইহার পূর্বে কি পৰ্তুগীজ ফিরিজির অত্যাচারের কথা কোন ওয়াটীয়ানবীশ লিখিয়া পাঠাইয়াছিল?

আসফ্। হাঁ, আহমদাবাদ, সাতগাঁও, ও জহাঙ্গীর নগরের ওয়াচীয়ানবীশ দুই তিন বার এই সংবাদ দিয়াছিল।

বাদশাহ্। ইহার পরে সুবা বাঙ্গালা ও সুবা গুজরাতে সমস্ত ওয়াচীয়ানবীশের সমস্ত পত্র যেন আমার নিকট উপস্থিত করা হয়।

আসফ্। জহাঁপনার হুকুম তামিল হইবে।

বাদশাহ্। শুন ওয়াইল্ড, কাশেম খাঁ বাঙ্গালার সুবাদার হইয়া যাইতেছে। আমি বাঙ্গালা ও গুজরাতে পর্তুগীজদিগকে শাসন করিব। তোমাদিগের সহিত পর্তুগীজদিগের বিবাদ আছে ?

ওয়াইল্ড। শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ চলিতেছে।

বাদশাহ্। তোমাদের জাহাজ পর্তুগীজদের সমস্ত জাহাজ ইরাণে এবং স্রট অঞ্চলে আটকাইয়া রাখিতে পারিবে ?

ওয়াইল্ড। পারিবে।

এই সময়ে শায়েস্তা খাঁ গোসলখানায় প্রবেশ করিয়া কহিলেন, “জহাঁপনা, এক হিন্দু ফকীর নাকারখানায় অপেক্ষা করিতেছে, সে বাদশাহের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে। তাহার নিকট শাহনশাহের নামাক্তিত অভ্যুরীয়ক ও পঞ্জা আছে।” বাদশাহ্ শায়েস্তা খাঁর কথা শুনিয়া বিচলিত হইয়া উঠিলেন, তিনি শায়েস্তা খাঁকে কহিলেন, “খাঁ সাহেব, আমার নামাক্তিত অভ্যুরীয় কেবল একজন হিন্দু ফকীরের নিকট আছে ; তিনি

আমার ও নবাব আলিয়া বেগমের পরম মিত্র, তুমি সম্বর তাঁহাকে লইয়া আইস।”

শায়েস্তা খাঁ অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন। বাদশাহ্ তখন আংরেজ প্রধান ওয়াইল্ডকে কহিলেন, “ওয়াইল্ড, তুমি স্বরটে ফিরিয়া যাও। যুদ্ধের বন্দোবস্ত কর।”

ওয়াইল্ড কহিলেন, “জঁপনা, আমি এতদিন চলিয়া যাইতাম, কেবল উজীরের হুকুম পাই নাই বলিয়া যাই নাই।”

মোগল সাম্রাজ্যের বন্দরশ্রেষ্ঠ স্বরটের আংরেজ কুঠীর প্রধান ওয়াইল্ড অভিবাদনান্তে প্রস্থান করিলেন, তখন শায়েস্তা খাঁ গৈরিকধারী এক দীর্ঘাকার গোরবর্ণ সন্ন্যাসীকে লইয়া প্রবেশ করিলেন। দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া বাদশাহ্ সিংহাসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাহা দেখিয়া আসফ্ খাঁ এবং শাহ্ নওয়াজ খাঁ ও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সন্ন্যাসী গোসলখানায় প্রবেশ করিলে, বাদশাহ্ স্বয়ং অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। তাহা দেখিয়া উজীর আসফ্ খাঁ ও নবাব শাহ্ নওয়াজ খাঁ সন্ন্যাসীকে অভিবাদন করিলেন। সন্ন্যাসী বাদশাহ্ কে অভিবাদন না করিয়া আশীর্বাদ করিলেন। এই সময়ে অগ্ন্যন্ত মুসলমান সভাসদগণ সন্ন্যাসীকে অভিবাদন করিলেন, কেবল দেওয়ান হরেকৃষ্ণ রায় তাঁহার পদধূলি লইয়া প্রণাম করিলেন। একজন খোজা বাদশাহের মসনদের সম্মুখে একখানা গালিচা বিছাইয়া দিল। সন্ন্যাসী উপবেশন করিলে, বাদশাহ্, শাহ্ নওয়াজ খাঁ ও আসফ্ খাঁ উপবেশন করিলেন।

সন্ন্যাসী কহিলেন, “জহাঁপনা, অল্প বাদশাহের দরবারে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।”

বাদশাহ্ হাসিয়া কহিলেন, “আপনাকে অদেয় আমার কিছই নাই। আপনি হুগলীতে আমার জান ও ইজ্জৎ রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই অবধি আমি আপনার হুকুম তামিল করিতে বাধ্য।”

“জহাঁপনা, হুগলী বন্দরের কথা মনে আছে?”

“ফকীর সাহেব, আমি জলালউদ্দীন আকবর বাদশাহের পৌত্র, হুজরউদ্দীন জহাঙ্গীর বাদশাহের পুত্র, আমার সকল কথাই স্মরণ আছে।”

“শীঘ্রই হুগলীতে পৰ্তুগীজ ফিরিঙ্গির সহিত আপনার যুদ্ধ হইবে।”

“কোন কথাই আপনার অবিদিত নাই।”

“জনাবে আলী, গঞ্জালীস্ ফিরিঙ্গিকে স্মরণ আছে?”

“আছে, সে কথা কখনও বিস্মৃত হইব না।”

“শীঘ্রই আপনার সেনা হুগলী দখল করিবে, তাহার পরে গঞ্জালীস্ যদি বন্দী হয়, তাহা হইলে তাহাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিবেন।”

বাদশাহ্ আসফ্ খাঁর দিকে ফিরিয়া কহিলেন, “সাহেব, এখনই ফরমাণ লিখিয়া আনিতে আদেশ করুন।”

সন্ন্যাসী কহিলেন, “জহাঁপনা, আর একটি নিবেদন আছে।”

বাদশাহ্ বলিলেন, “অনুমতি করুন।”

“হুগলীতে যত পৰ্তুগীজ রমণী বন্দী হইবে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার ভার যেন আমার উপর শুল্ক হয়।”

“আপনি যাহা ইচ্ছা করিবেন তাহাই হইবে।”

খাসদবীর আসিলেন, ফরমাণ লিখিত হইল, বাদশাহ্ তাহাতে মোহর অঙ্কিত করিলেন। সন্ন্যাসী ফরমাণ পাইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। আসফ্ খাঁর আদেশে শায়েস্তাখাঁর চর তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে গিয়া নগরমধ্যে সন্ন্যাসীকে আর খুঁজিয়া পাইল না।

সন্ন্যাসী প্রস্থান করিলে, আসফ্ খাঁ জিজ্ঞাসা করিলেন, “জহাঁপনা, এই কাফের ফকীর কে?”

বাদশাহ্ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, “সাহেব, ইনি কে তাহা বলিতে পারি না। হুগলীতে ফিরিজি হান্সাদ যখন আমার যথাসর্বস্ব লুণ্ঠিয়া লইয়াছিল, তখন এই মহাত্মা আপনার কণ্ঠার ইজ্জৎ রক্ষা করিয়াছিলেন এবং আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। অন্য পরিচয় অনাবশ্যক। কাশেম খাঁ, আপনি বাঙ্গালার সুবাদার নিযুক্ত হইলেন, এক বৎসরের মধ্যে সুবা বাঙ্গালা হইতে পৰ্তুগীজ ফিরিজি দূর করিতে হইবে।”

কাশেম খাঁ অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন বাদশাহ্ বিকলাঙ্গ বৈষ্ণবের নিকট আসিয়া, তাহার অঙ্গে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন, “ফকীর, আমার রাজ্যে বাস করিয়া তুমি অনেক যজ্ঞনা ভোগ করিয়াছ, তুমি কি চাহ?”

চৈতন্যদাস নয়ন মুদ্রিয়া ছিল, সে নয়ন মেলিয়া কহিল,
“মহারাজ, গোবিন্দের মন্দিরপ্রাপ্তে বাস করিতে চাহি।”

“আর কিছু চাহ না ফকীর?”

“আর কি চাহিব?”

তখন বাদশাহ্ অনামিকা হইতে বহুমূল্য হীরক অঙ্গুরীয়ক
খুলিয়া চৈতন্যদাসের হস্তে দিয়া কহিলেন, “ফকীর, এই চিহ্নটি
রাখিও, যদি কখন কোন প্রয়োজন হয়, তখন এই চিহ্ন
দেখাইও। আমি যখন যে স্থানে থাকিব তোমাকে বাদশাহী
কর্মচারিগণ সেই স্থানে লইয়া আসিবে।”

বাদশাহ্ নাল্‌কীতে আরোহণ করিয়া মহল্‌সরায় প্রবেশ
করিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

দিব্যদৃষ্টি

বাদশাহের নাল্‌কী যখন মহলে প্রবেশ করিল, তখন
হজরৎ মমতাজ-ই-মহল আরজ মন্দ বাণু বেগম রৌশন জহানী
আঙ্গুরীবাগের চত্বরে দাঁড়াইয়া লাল মাছকে আহাৰ দিতেছি-
লেন। বাদশাহ্ নাল্‌কী হইতে অবতরণ করিলেন এবং
বেগমের হস্ত ধারণ করিয়া রঙ্গমহলে প্রবেশ করিলেন। রঙ্গ-
মহলের সম্মুখে বাদীর সরদারণী মেহেদী বিবি ও খোজা 'হিম্মৎ

খাঁ যাকুৎ নিতান্ত অপরাধীর ভায়ে দাঁড়াইয়াছিল। বাদশাহ তাহাদিগের অবস্থা দেখিয়া বেগমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আলিয়া, ইহাদিগের কি হইয়াছে?”

বেগম বাদশাহের হস্তধারণ করিয়া যমুনাতীরস্থিত একটি কক্ষে লইয়া গেলেন এবং কহিলেন, “জহান্পনা, আমার আমলে মহলসরায় যাহা হয় নাই তাহাই হইয়াছে।”

“কি হইয়াছে?”

“আপনি স্বস্থ হউন, তাহার পরে বলিব।”

“আমি বেশ স্বস্থ আছি, তুমি বল।”

“বড় ভীষণ কথা, মহলসরায় দুই জন পুরুষ পরা পড়িয়াছে।”

“পুরুষ? কি জাতি?” - “বান্ধালী।” “বান্ধালী?”

“হাঁ জহান্পনা, একজন সুন্দর বলিষ্ঠ যুবক, আর একজন বৃদ্ধ; কিন্তু তাহার দেহে জীনের মত অসীম বল।”

“কোথায় ধরা পড়িল?”

“শিশুমহলের নীচে ফাঁসীখানায়।”

“কে ধরিল?” “আমি।” “তুমি?”

“হাঁ, জহান্পনা, সন্ধ্যার সময়ে যাকুৎ বাদী গুলজার আমাকে বলিল যে গুলরুখ্ রঙ্গমহলে এজন পুরুষ আনিয়াছে। আমি অন্ধকারে তাহার সন্ধান না পাইয়া গুলজারের কথা মিথ্যা মনে করিয়াছিলাম। আপনি আজ যখন দরবার

আমে তখন গুলজার আসিয়া বলিল যে ফাঁসীখানায় জহানারা ও গুলরুখ্ একজন পুরুষকে কতল করিতেছে। আমি ফাঁসীখানার উত্তরের দেওয়াল সরাইয়া দেখিলাম যে সত্য সত্যই জল্লাদ হিলাল্ খাঁ একজন মরদকে কতল করিতেছে। জহানারা বলে তাহার নাম সবুওয়ার্ খাঁ, সে গুলরুখের স্বামী, কিন্তু সে এক কাফেরুণীর জন্ত গুলরুখ্কে পরিত্যাগ করিয়া কাফের হইয়াছে। সে বলে যে তাহার নাম ময়ূখ, সে হিন্দু এবং গুলরুখ্ তাহার কেহ নহে। কি করিব স্থির করিতে পারিতেছি না।”

সহসা নবাব দেখিলেন আলিয়া বেগমের আকর্ষণবিশ্রান্ত নীলনয়নদ্বয় জলে ভরিয়া উঠিল, তিনি বাদশাহের উভয় হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, “জনাব, আমার একটি অমুরোধ রাখিবে?”

শাহ্ জহান সাদরে নয়নাশ্রু মুছাইয়া কহিলেন, “আলিয়া, হিন্দুস্থানের এক সীমা হইতে অপর সীমা পর্যন্ত তোমার আদেশ প্রতিপালিত হয়, তুমি যখন যাহা আদেশ কর আমি তাহাই করিয়া থাকি, এখনও করিব। তবে তোমার চোখে জল আসিল কেন?”

“দিলের, তাহার মুখখানি দারার মতন, তাহাকে প্রাণে মারিও না। যদি সে অপরাধী হয়, তাহা হইলে তাহাকে মোগল বাদশাহী এলাকা ছাড়াইয়া নির্বাসিত করিও।”

“তাহাই হইবে, সে যদি অপরাধী হয় তথাপি তোমার নয়নাশ্রুর অশ্রুরোধে তাহাকে মুক্ত করিব।”

বেগম আনন্দে আত্মহারা হইয়া বাদশাহের হস্তচূষন করিলেন, বাদশাহ্ হাসিয়া কহিলেন, “আলিয়া, অনেক দিন পরে ‘দিলের’ বলিয়া ডাকিয়াছ, আপনি বলিলে না, জহান্নপনা বলিলে না?” লজ্জায় আরজ মন্দ বাণুব্বেগমের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি বাদশাহের বক্ষে মুখ লুকাইয়া কহিলেন, “সকল সময়ে মনে থাকে না।”

“তবে বল কেন?”

“এখন যে তুমি বাদশাহ্ হইয়াছ, দিলের?”

“তথ্যে বসিয়া কি পর হইয়া গিয়াছি আলিয়া?”

“তাহা কেন? চল তাহাদিগকে দেখিবে।”

নিকটে অন্য এক কক্ষে ময়ূখ, ভুবন ও দুইজন থোড়া বসিয়াছিল। বাদশাহ্ কক্ষে প্রবেশ করিয়া ময়ূখকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, “মনুসবদার, তুমি এখানে?”

শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি ময়ূখকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল; তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিলেন এবং কহিলেন, “শাহান্শাহ্, তক্দির।”

তখন বাদশাহ্ বেগমকে কহিলেন, “আলিয়া, এ আমার নূতন মনুসবদার, ইহার পিতার জায় বিশ্বাসী ভৃত্য জহান্নপনার বাদশাহের বোধ হয় আর ছিল না।

এত মুসলমান নহে, বাঙ্গালী। কে তোমাকে রক্তমহলে আনিয়াছে ?”

ময়ূখ যাহা জানিতেন তাহা বলিলেন। তখন হিম্মৎ থা ও মেহেদী বিবির তলব পড়িল। তাহারা বলিল যে, গুলজার বাদী এই কাফেরকে লইয়া আসিয়াছিল, জহানারা বেগম বলিয়াছিলেন যে ইহা হজরৎ বাদশাহ্ বেগমের হুকুম। তখন বাদশাহ্ গুলরুখকে তলব করিলেন।

স্থির শান্ত তুষারশীতল ধবল মৰ্ম্মরমূর্তির ত্রায় গুলরুখ্ ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। রক্তবর্ণপাষণনির্মিত কক্ষ যেন উষার উজ্জ্বল কান্তিতে শুভ্র হইয়া উঠিল। তরুণী রমণীর রূপ জগদ্বিজয়ী, শাহ্ জহানের কঠোর সঙ্কল্প সহসা কোমল হইয়া গেল, হৃদয় দ্রবীভূত হইল, বাদশাহ্ উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া সন্মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, “গুলরুখ্, এ কে মা ?”

সুন্দর ওষ্ঠযুগল ঈষৎ কম্পিত হইল, গুলরুখ্ বলিল, “শাহনশাহ্, ইনি আমার দেবতা।”

“তুমি ইহাকে মহলসরায় আনিয়াছিলে ?”

“আনিয়াছিলাম।”

“স্বেচ্ছায় আনিয়াছিলে মা ?”

“শাহনশাহ্, পিতা কেমন তাহা দেখি নাই, আপনার নিকটে ও নবাব সাহেবের নিকটে জীবনে প্রথম পিতৃস্নেহ পাইয়াছি। মিথ্যা বলিব না, অনেক মিথ্যা কহিয়াছি, আরাধ্য

দেবতাকে বহু যত্না দিয়াছি। মোহের বশে কুপরামর্শে শয়তান ও শয়তানীর সাহায্যে, ইহাকে মাতার বাসস্থানে আনিয়া-
ছিলাম।”

“কাহার পরামর্শে আনিয়াছিলে গুলরুখ্?”

“এই চক্ষুর, পিতা, এই চক্ষুই আমার কাল। কেহ অপরাধী
নহে। গুলজার, ইরাদৎ, হিম্মৎ, হিলাল, মেহেদৌ বা শাহ্‌জাদী
কেহ অপরাধী নহে। অপরাধ আমার চক্ষুর। সুদূর সপ্তগ্রামে
ঐ দেবদুর্ভাগ্য রূপ আমার নয়ন অন্ধ করিয়া দিয়াছিল,
সেই অন্ধতার বশবর্তী হইয়া বহু অপরাধ করিয়াছি।
শাহান্‌শাহ্‌, আজি আপনার সাক্ষাতে দোষীর দণ্ডবিধান
করিব।”

গুলরুখ্ ক্ষিপ্ৰ হস্তে বস্ত্রমধ্য হইতে দুইটি তীক্ষ্ণধার লোহ
শলাকা বাহির করিয়া নয়নদ্বয়ে বিদ্ধ করিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে
নীলেন্দীবরতুল্য উজ্জ্বল নয়নদ্বয় হীনপ্রভ হইয়া গেল। তখন
যুবতীর পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডলে স্নান হাশ্বের ক্ষীণ রেখা ফুটিয়া
উঠিল, গুলরুখ্ বলিল, “আর দেখিব না, কিন্তু, প্রভু, অন্ধের
নয়নপথে তোমার শাস্ত স্নিগ্ধ সুন্দর মূর্ত্তি সতত বিরাজ
করিবে।”

দৃষ্টিশক্তিহীনা রমণী আরজ্‌মন্দ বাণু বেগমের দিকে হস্ত-
দ্বয় প্রসারিত করিল এবং কহিল, “মা, তুমি কোথায় মা?”

বেগম গুলরুখের রক্তাপ্নুত দেহ আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ
করিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। বাদশাহ্‌ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়া-

ইয়াছিলেন, তিনি ফিরিয়া দেখিলেন যে ময়ূখের গুপ্তস্থলে স্রোতের ঝায় অশ্রুধারা বহিতেছে।

সেই মুহূর্ত্তে আগ্রার এক দরিদ্র পল্লীর প্রান্তভাগে জনৈক দীর্ঘাকার গৌরবর্ণ সন্ন্যাসী দ্রুতবেগে পথ চলিতেছিল। সেই পল্লীর এক ক্ষুদ্র গৃহের বহির্দিশে এক গতযৌবনা রমণী কাহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল। সন্ন্যাসী তাহাকে দেখিয়া চমকিত হইয়া দাঁড়াইল। রমণীও সন্ন্যাসীকে দেখিল, তাহার সর্বদা কল্পিত হইল। সন্ন্যাসী দূর হইতে ডাকিল, “বিনোদিনী!”

কণ্ঠস্বর শুনিয়া রমণী মুচ্ছিতা হইল। তখন সন্ন্যাসী উদ্ধ্বাসে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

সেই দিন অপরাহ্নে সেইরূপ একজন গৌরবর্ণ দীর্ঘাকার প্রোট গুপ্তস্থল জুটাজুট মণ্ডন করিয়া কাশেমখাঁর আহদী সেনা-দলে প্রবেশ করিল।

চতুবিংশ পরিচ্ছেদ

পৰ্তু গীজশক্তির সমাধি

মুক্তিলাভ করিয়া ময়ূখ কাশেমখাঁর সহিত বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিলেন। বাঙ্গালার স্ববাদারী গ্রহণ করিয়া কাশেম ইয়ার খাঁ হুগলীর পৰ্তু গীজগণের বিনাশের উদ্যোগ আরম্ভ

করিলেন। সুবাদারের পুত্র এনায়েৎউল্লা, সেনাপতি আল্লা ইয়ার খাঁর সহিত হিজলী আক্রমণ করিবার ছলে সসৈন্ত বর্ধমানে পৌঁছিলেন। হুগলী আক্রমণের উদ্দেশ্য জানিতে পারিলে পাছে হুগলীর পৰ্তুগীজগণ জলপথে পলায়ন করে, সেই জন্ত মথ্‌সুসাবাদে বহাদর খাঁ কাছোহ ও নাওয়ারার সমস্ত কোশা ও গরাবের সহিত খাজা শের শ্রীপুর হইতে স্নন্দরবনে প্রেরিত হইলেন। স্থির হইল যে, নাওয়ারা পৰ্তুগীজগণের জাহাজ ঘাইবার পথ রুদ্ধ করিলে, আল্লা ইয়ার খাঁ বর্ধমাম হইতে এবং বহাদর খাঁ কাছোহ মথ্‌সুসাবাদ হইতে হুগলীর দিকে অগ্রসর হইবেন।

এই সময়ে ফিরিজিগণ একদিন সপ্তগ্রামে গোকুলবিহারী শেঠের গৃহ আক্রমণ করিল। প্রতিশোধ লইবার জন্য গোকুল-বিহারী ও সপ্তগ্রামের ফৌজদার হুগলী আক্রমণ করিলেন। যে দিন হুগলীর দুর্গ আক্রান্ত হইল, তাহার পরদিন রাত্ হইতে ময়ূখ এবং বাগ্‌ড়ী হইতে বহাদর খাঁ গোকুলবিহারীর সহিত মিলিত হইলেন। এই সময়ে খাজা শের কোশা ও গরাব দিয়া স্নন্দর-বনের জলপথ রুদ্ধ করিয়া হুগলীর দিকে অগ্রসর হইলেন। তখন বর্ধমান হইতে এনায়েৎ উল্লা খাঁ ও আল্লা ইয়ার খাঁ হুগলী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ১০৪০ হিজরায় অর্থাৎ ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে হুগলীর পৰ্তুগীজ দুর্গ চারিদিক হইতে আক্রান্ত হইল। পৰ্তুগীজ পাদ্রী ও ফিরিজি হান্‌মাদের অত্যাচারে প্রণীড়িত দক্ষিণ বঙ্গের অধিবাসিগণ দলে দলে বাদশাহী ফৌজে প্রবেশ

করিল। বহাদুর খাঁ কাশ্মোহ ও খাজা শের নৌকা সংগ্রহ করিয়া হুগলীর নিয়ে একটি নৌসেতু নির্মাণ করিলেন, ইহার ফলে হুগলী বন্দরের সমস্ত গরাব কোশা ও জালিয়া ডিঙ্গা বাদশাহী নাওয়ারা কর্তৃক ধৃত হইল। এইবার স্থলপথে পদাতিক ও জলপথে নৌসেনা হুগলী বন্দর ও দুর্গ আক্রমণ করিল, দুর্গের বহির্দেশে অবস্থিত নগর ও বন্দর আল্লা ইয়ার খাঁর দখলে আসিল।

তিন মাস যুদ্ধের পরে গোকুলবিহারী দুর্গ অধিকারের এক নূতন পথ আবিষ্কার করিলেন। গির্জার নিকটে হুগলী দুর্গের পরিখা সঙ্কীর্ণ ছিল, গোকুল বিহারীর নৌসেনা স্ফুট কাটিয়া সেই স্থানের জল বাহির করিয়া দিল। তখন বাদশাহী সেনা ভীষণ বেগে সেই স্থান আক্রমণ করিল।

এই সময়ে আল্লা ইয়ার খাঁর শিবিরে পর্তুগীজ ফিরিঙ্গীর এক নূতন শত্রু আসিয়া উপস্থিত হইল। একজন আংরেজ বণিক পর্তুগীজ দস্যুর আক্রমণে হতসর্বস্ব হইয়া গোয়ায় আসিয়াছিল; তথায় পর্তুগীজ পাদ্রাগণের অত্যাচারে তাহার চক্ষুদ্বয় নষ্ট হইয়াছিল। দৈবচক্রে হুগলী দুর্গ অবরোধের সময় সেই অন্ধ আংরেজ বণিক সপ্তগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে স্বদেশে যুদ্ধব্যবসায়ী ছিল, স্ফুট কাটিয়া বারুদ প্রয়োগে কিরূপে দুর্গপ্রাকার ধ্বংস করিতে হয় সে তাহা ফরাসী দেশে শিক্ষা করিয়াছিল। তাহার সাহায্যে ময়ূখ গির্জার নিয়ে স্ফুট কাটিয়া দুর্গপ্রাকার ধ্বংসের "চেষ্টা

করিতে আরম্ভ করিলেন। দুইতিন বার ব্যর্থমনোরথ হইয়া অন্ধ আংরেজ অবশেষে এক দীর্ঘ স্তূভ খনন করিল; তাহাতে শত শত মণ বারুদ সঞ্চিত হইল। ভয়ে কোনও মুসলমান বা হিন্দু সেনা সেই বারুদ রাশিতে অগ্নি সংযোগ করিতে স্বীকৃত হইল না। তখন স্ববাদারের একজন দীর্ঘাকার গৌরবর্ণ আহদী স্বেচ্ছায় সেই ভার গ্রহণ করিল।

চারিদিকে বাদশাহী ফৌজ দুর্গ আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল, তখন সেই আহদী হলদীপুরের শিবিরে আসিয়া ময়ূখের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিল। ময়ূখ তখন আল্লা ইয়ার খাঁ, এনায়েৎ উল্লা খাঁ, খাজা শের ও বহাদুর খাঁ কাম্বোহের সহিত পরামর্শ করিতেছিলেন। একজন সওয়ার আসিয়া তাঁহাকে কহিল, “মহারাজ, সেই হিন্দু শহীদ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন।”

ময়ূখ তাম্বুর বাহিরে আসিলেন। সেই আহদী তাঁহাকে কহিল, “ময়ূখ, আমাকে চিনিতে পার ?” সামান্য সৈনিকের মুখে এইরূপ সম্বোধন শুনিয়া ময়ূখ বিস্মিত হইলেন।

আহদী পুনরায় কহিল, “ললিতাহরণের দিনে গোরী-পুরের ঘাট স্মরণ হয় ?”

ময়ূখ অধিকতর বিস্মিত হইয়া কহিলেন, “হয়।”

“আমি সেই সন্ন্যাসী।”

“আপনি ?”

“হাঁ আমি। আমি ললিতার মাতুল, বিনোদিনীর ভ্রাতা। চতুর্দশ বর্ষ-পূর্বে গঞ্জালীস্ খড়দহ হইতে আমার যুবতী পত্নী ও বিনোদিনীকে বলপূর্ব্বক লইয়া আসিয়াছিল। আমার পত্নী আত্মহত্যা করিয়াছে, আমি জানিতাম বিনোদিনীও মরিয়াছে। আগ্রায় বিনোদিনীকে দেখিয়া আমি পূর্ব্ব সঙ্কল্প বিশ্বৃত হইয়াছি। মনে করিয়াছিলাম যে পর্ত্তুগীজের হুগলী শ্মশান করিয়া তথায় বাস করিব। কিন্তু বিনোদিনীর জার জীবিত আছে। অতঃ হুগলী দুর্গ অধিকৃত হইবে, তখন আমি জীবিত থাকিব না। যদি গঞ্জালীস্কে ধরিতে পার, তাহা হইলে স্বহস্তে তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া তাহার রক্তসিক্ত মৃত্তিকায় আমার চিতাশয্যা রচনা করিও। অনুপনারায়ণ মরিয়াছে, কল্যা বারবক্ সিংহের অধিকার পাইবে।”

আহদী উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। অর্দ্ধদণ্ড পরে ভীষণ শব্দে হুগলীর পর্ত্তুগীজ গিঞ্জা ও দুর্গ-প্রাকার আকাশে উখিত হইল এবং দুইদণ্ড পরে হুগলীর পর্ত্তুগীজ অধিকার লুপ্ত হইল।

ময়ূখ অসিহস্তে ফিরিঙ্গীপ্রধানের প্রাসাদের নিকটে আসিয়া দেখিলেন যে, মুষ্টিমেয় সেনা লইয়া ডিম্ভজা তখনও যুদ্ধ করিতেছেন। চতুর্দিক্ হইতে আক্রান্ত হইয়াও ডিম্ভজা আত্মসমর্পণ করিলেন না। ক্ষণকাল মধ্যে পর্ত্তুগীজ বীরগণ স্বজাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল।

জলগথে পলায়নের চেষ্টা করিতেছিল। সে বন্দী হইয়া ময়ূখের নিকটে আনীত হইল। গঙ্গাতীরে গঙ্গালীসের রক্তসিক্ত বালুকায় চিতা রচিত হইল, তাহাতে সন্ন্যাসীর দণ্ডাবশিষ্ট দেহ স্থাপিত হইল। বোধ হয় পরলোকে ত্র্যম্বকের আত্মা তৃপ্ত হইয়াছিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

পরিশিষ্ট

শীতের অপরাহ্নে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা আগ্রা দুর্গের অনতিদূরে শ্রাগল তৃণক্ষেত্রের সম্মুখে আসিয়া লাগিল। নৌকায় একজন নাবিক ও দুইজন আরোহী ছিল, তাহারা অবতরণ করিল। আরোহিষ্যের একজন পুরুষ ও অপর জন রমণী। পুরুষ নাবিককে জিজ্ঞাসা করিল, “ভুবন, সমাধি কোথায়?”

নাবিক যমুনাতীরে হরিদ্বর্ণ দূর্বাক্ষেত্র দেখাইয়া দিল, আবোহিষ্য সেই দিকে চলিল।

তখন অন্তগমনোন্মুখ প্রৌঢ় তপনের হীনপ্রভ কিরণে রক্তবর্ণ পাষাণনির্মিত আগ্রার দুর্গের শীর্ষে শুভ্র মতি মসজিদের শুভ্রতর মিনার স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত হইতেছিল। উচ্চ ভূখণ্ডে

শ্রামল তৃণক্ষেত্রের মধ্যভাগে একটি ক্ষুদ্র নির্মল শ্বেতমর্মর-
নির্মিত সমাধি, কালিন্দীর নীলাম্বুরাশি আকুল হইয়া 'সেই
সমাধির পাদমূলে আছাড়িয়া পড়িতেছিল। সমাধি আলিঙ্গন
করিয়া শুভ্রবসনপরিহিত একজন প্রৌঢ় মুসলমান স্থির হইয়া
বসিয়াছিল এবং তাঁহার পদতলে শীর্ণদেহা মলিনবেশা
এক অন্ধ রমণী নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতেছিল।
নৌকার আরোহিণী ও নাবিক তাঁহাদিগকে দেখিয়া দূরে
দাঁড়াইল।

পুরুষ জিজ্ঞাসা করিল, "ও কে ভূবন?" ভূবন অতি
ধীরে কহিল, "বলিতে পারি না মহারাজ!"

রমণী অশ্রুত স্বরে কহিল, "কাছে গিয়া কাজ নাই, দূর
হইতে দেখিয়া ফিরিয়া যাই।"

পুরুষ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ললিতা?"

"উনি কে বুঝিতে পারিতেছ না?"

"না।"

"আমি দেখিয়াই বুঝিয়াছি।"

"কে ললিতা?"

"আর কে? স্বয়ং বাদশাহ।"

এই সময়ে সেই প্রৌঢ় মুসলমান সমাধিবক্ষ হইতে মুখ
তুলিল। ময়ূখ বিস্মিত হইয়া দেখিলেন যে হিন্দুস্থানের একচ্ছত্র
সম্রাট বাদশাহ, শাহজহান জনশূন্য প্রাপ্তবয়স্ক শূন্য
মস্তকে সমাধিপার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন।

তখন ললিতা কহিলেন, “চোখে দেখি নাই কেবল তোমার মুখে শুনিয়াছি। যখন আসিয়াছি তখন একবার স্পর্শ করিয়া যাইব। আমরা এই খানে দাঁড়াইয়া থাকি, বাদশাহ্ চলিয়া গেলে নিকটে যাইব।”

সহসা স্বপ্ন প্রান্তরের জড়তা ভঙ্গ করিয়া করুণ কোমল
কণ্ঠে স্নমধুর সঙ্গীতধ্বনি উত্থিত হইল। দূর্বাশ্মেত্রের অপর
প্রান্তে কে গাহিয়া উঠিল,—

অতি মনোহর বাজয়ে সুসর '

শুনিয়া পরাণ যা এ ।

কিরূপ বাঁশী বোল বরাযি

কেমনে তাক বাজা এ ॥

বাণীর বিন্দুত মুখ সংযোজিয়া

সপত সর বাজা এ।

নাগর শেখর নান্দের সুন্দর

বড় চণ্ডীদাস গাএ ॥

সঙ্গীতধ্বনি শুনিয়া বাদশাহ্ চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তখন ময়ূখ বাদশাহকে অভিবাদন করিলেন। বাদশাহ্ বিষন্ন বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি গান গাহিতেছিলে?” ময়ূখ কহিলেন “না জহাঁপনা।”

“তবে কে গাহিল?”

“তাহাত বলিতে পারি না, প্রান্তরের অপর পারে
কেহ* গাহিয়া থাকিবে।”

“মনসবদার, এ কোন্ ভাষার গান?”

“জনাব আলী, ইহা বাঙ্গালা গান।”

“আওয়াজ বড়ই মিঠা, তুমি উহাকে ডাকিয়া আনিতে পার?”

ময়ূখ ললিতার দিকে চাহিলেন, বাদশাহ্ তাহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার সঙ্গে কে?”

ময়ূখ অবনত বদনে কহিলেন “শাহান শাহ্, আমার স্ত্রী।”

বাদশাহ্ কহিলেন, “তোমার স্ত্রী আসিয়াছেন কেন?”

“হজরৎ বাদশাহ্ বেগমের সমাধির ধূলা লইয়া যাইতে।”

“নিকটে আসিতে বল, উহাকে গুলরুখের কাছে রাখিয়া তুমি গায়ককে ডাকিয়া আন।”

তখন ময়ূখের দৃষ্টি জীর্ণা শীর্ণা মলিনবসনাচ্ছাদিতা দৃষ্টি-শক্তিহীনা রমণীর দিকে আকৃষ্ট হইল। তিনি দেখিলেন যে, রমণী উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে; মণিহারী কোটরগত নয়নদ্বয় বিস্ফারিত হইয়াছে; ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে। সে কখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তিনি যখন বাদশাহের সহিত কথা কহিতেছিলেন, তখন অন্ধের শ্রবণপথে তাঁহার কণ্ঠস্বর প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। বাদশাহের সহিত বাক্যালাপ করিতেছিলেন বলিয়া, গুলরুখ্ এতক্ষণ কথা কহেন নাই। সে কি বলিবার জন্ত উৎকণ্ঠিতা হইয়াছিল। বাদশাহের উক্তি শেষ হইলে, গুলরুখ্ বলিয়া উঠিল, “দেবতা, তোমার রূপরাশির মধ্যে এত কঠোরতা

লুকাইয়া ছিল, তাহা জানিতাম না। তুমি আবার কেন আমার নিকটে আসিয়াছ ?”

ময়ূখ বিন্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। গুলরুখের অঙ্গের আবরণ খসিয়া পড়িল, রক্ত তৈলহীন কেশরাশি, রক্তহীন, জ্যোতিহীন, পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডলের চারিপার্শ্বে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। দৃষ্টিশক্তিহীন পুনরায় বলিয়া উঠিল, “দেবতা, আমার অন্ধকারময় জগতে তুমি একমাত্র আলোক, তোমার মূর্তি সর্বদা আমার দৃষ্টিশক্তিহীন নয়নের সম্মুখে চিত্রিত রহিয়াছে, কিন্তু তুমি নিকটে আসিও না, দূরে থাকিও। তোমার কণ্ঠস্বর বা পদশব্দ শুনিলে আমি উন্মাদ হইব।”

বাদশাহ্ অশ্রুট স্বরে তাহার কর্ণমূলে কি কহিলেন। তাহা শুনিয়া গুলরুখ শিহরিয়া উঠিল, সে কহিল, “কই? কোথায় তুমি? কোন্ দিকে?”

গুলরুখ উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া কহিল, “তোমাকে একবার দেখিব, নয়ন থাকিতে দেখি নাই, একবার স্পর্শ করিব। বহিন্, তাহাতে কি তুমি অপবিত্রা হইবে?”

বাদশাহ্ কহিলেন, “মনসবদার, গুলরুখ তোমার পত্নীকে স্পর্শ করিতে চাহে।”

ময়ূখের অল্পমতিপ্রাপ্তির পূর্বেই ললিতা গুলরুখের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাহার পদশব্দ শুনিয়া গুলরুখ দুই-পক্ষ অগ্রসর হইল এবং ললিতাকে স্পর্শমাত্র নিবিড়

আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিল। বাদশাহ্, মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন।

বহুক্ষণ পরে আত্মসম্বরণ করিয়া ময়ূখ গায়কের সন্ধানে চলিলেন। এখন যে স্থানে তাজগঞ্জের বাজার তখন সে স্থান বিস্তৃত তৃণক্ষেত্র ছিল। ময়ূখ দেখিতে পাইলেন যে প্রান্তরের সীমায় এক কৃশকায় বিকলাঙ্গ অসিতবরণ বৃদ্ধ ধূলায় বসিয়া আছে। ময়ূখ তাহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমিই কি গীত গাহিতেছিলে?”

বৃদ্ধ পরিষ্কার বাঙ্গালায় কহিল, “হাঁ বাবা, চলিবার শক্তি নাই, মনে করিলাম গীত গাহিলে যদি কেহ অনুগ্রহ করিয়া আসিয়া লইয়া যায়।”

“তুমি কোথায় যাইবে?”

“ঐ সমাধির নিকটে।”

“আমি তোমাকে ঐখানে লইয়া যাইতেই আসিয়াছি।”

ময়ূখ বৃদ্ধকে ক্রোড়ে উঠাইয়া সমাধির নিকটে লইয় গেলেন। বৃদ্ধ বস্ত্রমধ্য হইতে একটি বহুমূল্য হীরকাজুরীয়ক বাহির করিয়া ময়ূখের হস্তে দিল। ময়ূখ তাহা বাদশাহের হস্তে দিলেন। বাদশাহ্ অজুরীয়ক দেখিয়া চমকিত হইলেন। তিনি কহিলেন, “ফকির, তুমি সপ্তগ্রামের সেই বৈষ্ণব?”

বৃদ্ধ কহিল, “হাঁ মহারাজ, আমার কিছু প্রার্থনা

“প্রাসাদে গেলে না কেন?”

“মহারাজ, আমার মন বলিয়া দিল যে ইহাই উপযুক্ত স্থান।”

“ককির, তুমি কি চাহ?”

“আমার গুরু বন্দী হইয়া আছেন, মহারাজ দয়া করিয়া তাহাকে মুক্তি প্রদান করুন।”

তখন মমতাজ-ই-মহল আরজ মন্দ বাণুবগয়ের জগদ্বিখ্যাত সমাধির ভিত্তি নির্মিত হইতেছিল। কতিপয় ফিরিজি বন্দী দূরে মৃত্তিকা বহন করিতেছিল, বৃদ্ধ অঙ্গুলি চালন করিয়া তাহাদিগের একজনকে দেখাইয়া দিল। বাদশাহের আদেশে ময়ূখ তাহাকে ডাকিয়া আনিলেন। বিকলাঙ্গ বৃদ্ধকে দেখিয়া ফিরিজি শিহরিয়া উঠিল। বৃদ্ধ সস্মিত বদনে তাহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, “একদিন পথভ্রান্তকে পথপ্রদর্শন করিয়াছিলে, অতএব তুমি আমার গুরু, বাদশাহের আদেশে তুমি মুক্ত।”

বাদশাহ ময়ূখকে ইঙ্গিত করিলেন, ময়ূখ ফিরিজির বন্ধন মোচন করিলেন। ফিরিজি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সহসা ষমুনাতীর হইতে প্রবল বেগে বায়ু বহিল, সৈকতের রাশি রাশি কাশগুচ্ছ সমাধির স্তম্ভ মন্দিরের উপরে ছড়াইয়া পড়িল, বাদশাহ্ কঠিন শীতল শ্বেত মন্দির আলিঙ্গন করিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাহার পশ্চাতে গুলরুখ ও ললিতা নতজান্ন হইয়া উপবেশন করিলেন। তাহা দেখিয়া ময়ূখও সমাধির

পশ্চাতে জামু নত করিয়া মন্তক অবনত করিলেন। এককণে ফিরিঙ্গির নয়নে অশ্রু দেখা দিল, সে স্বদেশের প্রথানুসারে নতজামু হইল।

সেই ফিরিঙ্গি বন্দী ছগলীর পাত্রী আলভারেজ।

সমাপ্ত

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

যুরোপ প্রভৃতি মহাদেশে “ছয়-পেনি-সংস্করণ”—“সাত পেনি-সংস্করণ” প্রভৃতি নানাবিধ স্থলভ সংস্করণ প্রকাশিত হয়—কিন্তু সে সকল পূর্কপ্রকাশিত, অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যের পুস্তকাবলীর অন্ততম সংস্করণ মাত্র। বাঙ্গালাদেশের লক্ষ-প্রতিষ্ঠ কীর্তিকুশল গ্রন্থকারবর্গরচিত মারবান্, সুখপাঠ্য, অথচ অপূর্ক-প্রকাশিত পুস্তকগুলি কি এইরূপ স্থলভে দেওয়া যায় না? অধুনা দেখিয়া শুনিয়া আমাদের বিশ্বাস হইয়াছে যে—যায়, যদি কাট্টি অধিক হয় এবং মূল্যবান সংস্করণের মতই কাগজ ছাপা বাঁধাই প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গশুদ্ধ হয়। কারণ এই কথা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, বাঙ্গালাদেশে পাঠকসংখ্যা বাড়িয়াছে, আর বাঙ্গালাদেশের লোক ভাল জিনিসের কদর বুঝিতে শিখিয়াছে; এ অবস্থায় ‘আট-আনার গ্রন্থমালা’ কেন চলিবে না?—সেই বিশ্বাসের একান্ত বশবর্তী হইয়াই, আমরা এই অভিনব চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমাদের চেষ্টা যে সফল হইয়াছে, ‘অভাগী ও ‘পল্লী-সমাজের’ এই সামান্য কয়েক মাসের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপিবার প্রয়োজন হওয়াই তাহার প্রমাণ।

বাঙ্গালা দেশে—শুধু বাঙ্গালা কেন—সমগ্র ভারতবর্ষে, এতদুপ উত্তম এই প্রথম। আমরা অহুরোধ করিতেছি, বাঙ্গালী

মাট্রেই আট-আনা-সংস্করণ গ্রন্থাবলীর নির্দিষ্ট গ্রাহকশ্রেণীভূত হইয়া এই ‘সিরিজের’ স্থায়িত্ব সম্পাদন ও আমাদের উৎসাহ-বর্দ্ধন করুন।

কাহাকেও অগ্রিম মূল্য দিতে হইবে না, নাম রেজেষ্টারী করিয়া রাখিলেই আমরা যখন যেখানি প্রকাশিত হইবে, সেইখানি ভি, পি ডাকে প্রেরণ করিব। সর্বসাধারণের সহানুভূতির উপর নির্ভর করিয়াই আমরা এই বহুব্যয়সাধ্য কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি; গ্রাহকের সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকিলে আমাদের দিগকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় সংস্করণ ছাপাইয়া অধিক ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে না।

এই সিরিজের—

প্রকাশিত হইয়াছে—

১। অভাগী

(দ্বিতীয় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন

২। স্বর্নপাল

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ

৩। পল্লী-সমাজ

(দ্বিতীয় সংস্করণ) শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৪। কাঞ্চনমালা

মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

এম্ এ, সি আই ই

৫। বিবাহবিপ্লব

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল

৬। চিত্রালি

শ্রীস্বধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এল

৭। দূর্বাদল

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত

৮। শাস্ত্রতত্ত্ব ভিত্তিক

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, পি, আর, এস

৯। বড়বাড়ী

শ্রীজলধর সেন

১০। অরক্ষণীয়া

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১১। মনুস্মৃতি

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ

১২। সত্য ও মিথ্যা (যন্ত্রস্থ)

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,

২০১, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা

ଅଙ୍କର ପ୍ରଣୀତ

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ

- | | |
|----------------------|-----|
| ୧। ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଦ୍ଧା | ୨୧ |
| ୨। ବାଙ୍ଗ୍‌ଲାର ଇତିହାସ | ୨୧୦ |

ଶ୍ରୀମତୀ କାଞ୍ଚନମାଳା ପ୍ରଣୀତ

ଗନ୍ଧେର ବହି

- | | |
|----------|-----|
| ୧। ସ୍ତବକ | ୧୧୦ |
| ୨। ଗୁରୁ | ୧୧୦ |

